সচিত্র

মানব-লীলা।

(আধ্যাত্মিক পুস্তক)

কলিকাতা সিম্‌লা ৩৮ নং আর্য্য চিত্রালয় হইতে

শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

চৈতন্যাব্দ ৪০৩।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

দেব! জগতের মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ তামসিক রসোন্মত্ত জীবদিগের আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দর্শনে আপনার হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইয়া থাকে, তাই আপনার অনুকম্পায় ও উপদেশে এ দাস সম্পূর্ণরূপে নূতন প্রণালীতে আধ্যাত্মিক চিত্রাবলী প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়।

সম্প্রতি সচিত্র মানবলীলা নামধেয় আধ্যাত্মিক যে পুস্তক খানি এ দাসের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন মানসে তাহা ভবদীয় শ্রীকর-কমলে এ দাসানুদাস উৎসর্গ করিয়া দিলেক। এতদ্দৃষ্টে যদি আপনার কণামাত্র সন্তুষ্টি লাভ হয়, তাহা হইলেও দাস কৃতার্থ হইবে।

শ্রীচরণাশ্রিত অযোগ্য ভৃত্য

শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

মানব জন্ম বড় [illegible] মানব দেহ ধারণ করিয়া যদি ন্যায় পথে [illegible] বিদ্যা ও ধনোপার্জ্জন করা যায়, যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি করত আর্য্য ঋষি দিগের উপদেশ মত স্বার্থ হীন হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা গৃহ ধর্ম্ম পালন করা যায়, ভক্তি পূর্ব্বক পিতা মাতা, স্বামী, দেব দ্বিজ, গুরু ও অতিথির সেবা শুশ্রূষা [illegible] যায়, [illegible] বিপদ [illegible] রোগ শোক [illegible] এই [illegible] তুল্য অমর ধাম হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

মানবগণ আশু সুখ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কাম ক্রোধ লোভ, মোহ ও অহঙ্কারাদি রিপুর বশীভূত ও তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া নানা রোগ ও দুঃখ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যু মুখে নীত ও পরিণামে নরকের ভীষণ যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

শিব বন্দনায় ভারত চন্দ্র বলেন—

মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব,
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।

অজ্ঞান তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়,
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥

শিব তুল্য জীবের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন মহৎ কৃপায় ও আজ্ঞানুসারে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তি সম্ভূত সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে আমি আধ্যাত্মিক চিত্রাবলী প্রকাশারম্ভ করি। তিন বৎসর গত হইল, কালচক্র বা মানবের দশ দশা নাম দিয়া একখানি চিত্রপট প্রকাশ করিয়াছিলাম, তদবধি তদনুযায়ী সচিত্র এক খানি আধ্যাত্মিক পুস্তক প্রচার করিতে আমার বাসনা থাকে, তদনুসারে বহুদর্শী কতিপয় সুলেখক দ্বারা আমি এই পুস্তক রচনা করাইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

জীবের গর্ভস্থাবস্থার দশ অবস্থা এবং ভূমিষ্ঠের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত দশ দশা; তার পর স্বর্গে বা যমালয়ে নীত হওনাদি সুরাঙ্কিত ত্রিশ খানি চিত্রও এই পুস্তকে আছে। মনোযোগ পূর্ব্বক চিত্র দর্শন ও গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করত আর্য্যঋষিগণের উপদেশমত সৎপথে গমন করিলে অবশ্যই জীব শিব হইতে পারেন। এ হেন মনুষ্য কর্ম্ম-দোষে পশু তুল্য হইলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে।

এক্ষণে অদোষদর্শী সাধু মহাত্মাগণ কৃপা পূর্ব্বক দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, এই প্রার্থনা।

চিত্রের সূচী।

অবতরণিকা।

আমরা অর্থাৎ মানব-জাতি কীটাণুকীট তুল্য অতি হেয় ও তুচ্ছ পদার্থ। আত্ম তত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত অতি জ্ঞানবান ও ভক্তিমান কোন সাধু মহাত্মা বলেন "পুরীষের কীট হইতে আমি সে লঘিষ্ঠ" বাস্তবিক উক্ত ভক্ত সাধুর এই অগ্নিময় বাক্য অলঙ্ঘনীয়। প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিলে লেকের আর কখনই এ বোধ হয় না। এ রূপ জ্ঞান লাভ করা সুকৃতি সাধ্য। যথা—"পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং ধনং, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং, অগ্রে ধাবতি ধাবতি"।

কোথায় পরমাশ্চর্য্যময় সর্ব্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্য-ময়* ভগবান, আর কোথাই বা ক্ষুৎপিপাসাতুর দুর্ব্বল ক্ষণ-ভঙ্গুর অজ্ঞানাধীন মানব। কোথায় ঈশ্বরের অনন্ত ভাব, আর কোথায় আমাদের শর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র মস্তক। আমরা কি এই ক্ষুদ্রমস্তক-স্থিত সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির

---

* ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ইত্যাদি।

দ্বারা মহান্ পরমেশ্বরের অচিন্ত্য অনাদি অনন্ত মহিমা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারিব? কখনই না। ঈশ্বর চিদ্বস্তু। আমাদের আত্মা চিদণু হইলেও যে জড়দেহ সহবাসে জড়ময় হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের সত্তা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। জড় শরীরে বাস করতঃ তাহাতে নির্লিপ্ত-বৎ থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিলে আর মনে মনে ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে পারিলে, তাঁহাকে জানা যায় ও তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরি দর্শনে কৃতার্থ হওয়া যায়। তাহা হইলে মনুষ্যকে আর যমের অধীনে বা অধিকারে থাকিতে হয় না, এবং ব্যাধির দ্বারা প্রপীড়িত হওত কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। তখন তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্পের বা চিংড়ি মাচের খোলোস ছাড়ার ন্যায় ইচ্ছানুসারে দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্তামর ধামে অনায়াসে চলিয়া যান। আর আনন্দময় হইয়া নিত্য ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

মনুষ্য সামান্য অর্থকরী বিদ্যা ও ধন লাভার্থে যত কষ্ট ও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে

ঈশ্বর লাভাশয়ের তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে পাইতে আর তত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না, তথাপি ঈশ্বরকে লাভ করিতে লোকের কেন যে প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানবের এটী একটী বিষম ব্যারাম বলিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এ রোগের এক মাত্র ঔষধ বিবেক বৈরাগ্য ও চৈতন্যোদয়। আর পথ্য সৎগ্রন্থ পাঠ।

শরীর সুস্থ ও নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখিতে হইলে যেমন পবিত্র সুখাদ্য ভোজন, সুশীতল নির্ম্মল জল পান, পরিষ্কৃত সুগন্ধ মন্দমন্দ গন্ধবহ সেবন এবং পরিষ্কার শুষ্কগৃহে বাস ও উপযুক্ত পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান করা আবশ্যক, তেমনি অনন্ত স্থায়ী আত্মাকে পুনঃ পুনঃ [illegible] মরণরূপ অশেষ যন্ত্রণাকর ভয়ানক দুর্গতিজনক [illegible]ক হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দময় করিতে [illegible]লে সৎগ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ ভজন করা [illegible]তান্ত প্রয়োজন। আর কুগ্রন্থ ও কুসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ [illegible] অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ কাল কয় জন মনুষ্য [illegible]ই কর্ত্তব্য পালনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন?

মনুষ্যোচিত কার্য্যে মনোযোগী না হইয়া পশুবৎ ব্যবহারে মানুষের প্রবৃত্তি হয় কেন? শিক্ষা ও সঙ্গ-দোষই ইহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থাৎ এক্ষণকার প্রচলিত অসার ও কৃত্রিম শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের আশু বীতরাগ না জন্মিলে আর দেশের মঙ্গল নাই।

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ প্রদর্শিত শিক্ষাপথাবলম্বনে লোকে স্বর্গ পর্য্যন্ত উত্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা মানবকে নরকে নিমগ্ন হইতে হইতেছে! মানুষ পশুরূপে, সতী কুলটায়, রাজা দস্যুরূপে, ধর্ম্ম প্রতারণায়, সত্য মিথ্যাতে, ভক্তি ভণ্ডামিতে, পবিত্রাচার ম্লেচ্ছাচারে, প্রকৃতবস্তু কৃত্রিমতাতে, দয়া নিষ্ঠুরতায়, বিশ্বাস অবিশ্বাসে, ব্রহ্মচর্য্য লম্পটতায় পরিণত হইতেছে! ঈশ্বর সদৃশ ঋষি বাক্য অবহেলা করিয়া আধুনিক লোকে ম্লেচ্ছ-বাক্য শিরোধার্য্য করিতেছে!! এই সকল স্পষ্টরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন আর্য্য শিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন ও সেই মঙ্গলময় সত্য শিক্ষার পুনঃ প্রচলন মানসেই মানবের অবশ্য জ্ঞাতব্য অমূল্য আধ্যাত্মিক মানবলীলা গ্রন্থের অবতারণা হইয়াছে।

সচিত্র

মানব-লীলা।

প্রথম অধ্যায়।

জীব তত্ত্ব।

জীবগণ জননী জঠর-কারাকূপ হইতে নিসৃত হইয়া এই মায়াময় জগতে আগমন করত পুনর্ব্বার সংসার কারাগারে আবদ্ধ হয়, আর ভয়ানক মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করত অবশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি নানা দেহ ধারী এই জীব কে? এবং তিনি কি জন্যে কোথা হইতে কি প্রকারে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন, কেনই বা গর্ত্ত-কারাগারে বন্দী ভাবে থাকেন, আর কি কার্য্য সাধন জন্য কয়েক দিবস এ সংসারে থাকিয়া বাল্য যুবা জরাদি বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করত

পরিশেষে মৃত্যু-কর্ত্তৃক কোথাই বা নীত হন? এবং তথায় গিয়া তাঁহাকে কি অবস্থায় অবস্থান করিতে হয়, এ-সকল বিষয় অবগত হওয়া ও তাহা জ্ঞাত হইয়া আপ-নাপন মঙ্গল-জনক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বুদ্ধি-মান মানব গণের নিতান্তই আবশ্যক।

অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, মঙ্গল-বিধাতা; সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময়। তিনি নিয়তই আমাদিগের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের নিত্য পরম-কারুণিক পিতা মাতা এবং ভক্তাধীন ভগবান। আমাদিগের ন্যায় মাতৃ পিতৃ দ্রোহী অধম সন্তানের ও পবিত্র চেতা ভক্ত-জনের জন্যে তিনি সকলি করিতে পারেন। তিনি আমাদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই আমাদিগকে নিকাম-কর্ম্মের অধীন করি-য়াছেন। আমরা কর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ হইয়া কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে কখন বা নরকে নীত হইয়া থাকি। কিন্তু দয়াময়ের এমনি দয়া, তিনি কায়-বূ্যহ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগের পিতা মাতা হইয়া তথায় গিয়া আমা-দিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁহার দয়া অসীম। আমরা নিজ নিজ পাপ কর্ম্মের জন্য যে সমস্ত শাস্তি পাইবার যোগ্য, করুণাময় জগৎপিতা নিজ দয়া, বাৎসল্য ও শক্তি প্রভাবে তাহার বিস্তর লাঘব করিয়াছেন। আমরা যে পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছি, তাহা অনুভবই করিতে পারি না।

এক ব্যক্তির বড় শিরোপীড়া হইয়া তাহার মস্তকের ভিতর কীট জন্মিয়া মস্তিষ্ক ভক্ষণ করিতে থাকে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে তাহার আত্মীয় লোক কর্ত্তৃক সুযোগ্য চিকিৎসক আহূত হইলে, চিকিৎসক মহাশয় রোগীকে ক্লোরাফরম করিয়া (অর্থাৎ ঔষধ বিশেষের আঘ্রাণ দ্বারা মূর্চ্ছিত করত) অস্ত্র দ্বারা তাহার মাথার খুলি খুলিয়া কীট সকল বিনাশ করেন, তার পর সেই মস্তকের খুলি সেলাই করিয়া পুনরায় তাহাকে ঔষধ বিশেষের আঘ্রাণে চেতনাযুক্ত করেন। এই উপায়ে এমন ভয়ানক অস্ত্র চিকিৎসায়ও উক্ত রোগী যেমন বিনা যন্ত্রণায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট মায়া

মোহাদি দ্বারা আমরা মুগ্ধ হইয়া পাপ-জনিত দণ্ড ভোগের যাতনা অনুভব করিতে পারি না। আমরা নরক ভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্তি বোধ না করিয়া বরং তাহাতেই আবার উৎসাহিত ও পুলকিত হইতেছি।

মেথরেরা প্রত্যক্ষ নরক ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি তাহারা কষ্ট বোধ করে? না তাহাতে তাহাদের কিছু লজ্জা বা ঘৃণা বোধ হয়? তাহারা দুই হস্তে নানা জাতীয় লোকের বিন্মূত্র পরিষ্কার করিতেছে— মস্তকে করিয়া পুরীষ বহন করিতেছে!! ইহারা যদি মুগ্ধ না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাকর বোধ হইত।

মল মূত্র পূঁয রক্ত দারুণ দুর্গন্ধময় ক্লেদযুক্ত ঘোরতর অন্ধকার ও অতি সংকীর্ণ নির্ব্বাত গর্ভ-কারাগারে দশ মাস জীব অতি কষ্টে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রূণস্থ জীব যদি অজ্ঞান-মুগ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সেই কষ্ট যাতনায় সে কখনই ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিত না।

কোন কোন মহাত্মার গর্ভবাস কালে দিব্য জ্ঞান থাকে এবং তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত

হয়েন, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কথা সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন।

মাতৃ শোণিত ও পিতৃ-শুক্রে জীবোৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই জীব পিতা মাতার প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হয়। এ জন্য সাধু তুলসীদাস বলেন—

এক রাহসে হোতে হ্যঁায় মূত আওর পুত।
রাম ভজে ত পুত হ্যঁায় নেহিত মূতকা মূত॥"

কর্ম্ম দোষেই জীবের জন্ম হয়, তাহাতে প্রথমতঃ এত কুৎসিত ও নারকীয় হেয় অবস্থা গ্রস্ত হইতে হয় যে, নিজ নিজ জন্ম বৃত্তান্ত পরিচয় দিতে সকলকেই লজ্জিত হইতে হয়। তবে সকল বানরের মুখপোড়া গোচ সকল মানবের জন্ম প্রণালী একই রকম বলিয়া আমরা যেন ইহাতে কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু মনে মনে ত সকলি জানি।

এই ত গেল আমাদের জন্ম বৃত্তান্ত। তার পর অন্তকালের কথা আবার শুন। পাঠক! সে কথা তোমার নিকট নূতন না হইলেও, তাহা আর এক বার পাঠ করিতে তুমি কখনই বিরক্ত হইবে না, সেই ভরসায় আমি এই খানেই সেই পুরাতন কাহিনী

আরম্ভ করি। সাধু মৃত্যু ছাড়িয়া দাও; সিদ্ধপুরুষের আবার মৃত্যু কি? অনেক মহা-পুরুষ অমরত্ব লাভ করত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কিন্তু সচরাচর লোকের মৃত্যু বড় ভয়ানক, যন্ত্রণাকর ও ঘৃণাকর। মরণান্তে কত লোকের মৃত দেহ যে, পচিয়া দুর্গন্ধ. দেখিতে ঘোর বিভৎসাকার ও শৃগাল কুকুর কাক শকুনি প্রভৃতির খাদ্য রূপে পরিণত হয়, তাহার আর ইয়ত্ত্বা নাই।

আমি কোন্ কালে শৃগালের পেটে পচিতাম কিন্তু ভগবান্ তাঁহার কোন্ মহান্ কার্য্য সাধনার্থে, অথবা নরাধমের পাপের ভরা পরিপূর্ণ করণার্থে এ হতভাগারে এতকাল জীবিত রাখিয়াছেন বলিতে পারি না। আমি যখন সূতিকালয়ে ১২ দিনের ছেলে, তখন এক দিবস আমার মাতা নেকড়া কাচিতে খিড়কীর পুষ্করিণীতে গিয়াছিলেন, সূতিকালয়ের দ্বার খোলা ছিল, এবং ঘরের মধ্যে আগুণ জ্বলিতেছিল, একটী শৃগাল তথায় আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া উকি মারিতেছে, এমন সময় প্রতিবাসী এক স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলে শৃগাল

পলায়ন করে। এইরূপে ভগবান সেই আসন্ন মৃত্যু হইতে এ পাপাত্মাকে রক্ষা করিয়া আজি ৫১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহার মহান্ অভিপ্রায় ও তাঁহার মহা নামের জয় জয়কার হউক।

যখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও দেহের আদি অন্ত এইরূপ জঘন্য তখন এ ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরের আর গরিমা কি? তথাপি মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অতি মহৎ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্টিত রহিয়াছেন। তাঁহার অখণ্ড মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়মাবলি কেবল আমাদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি আমাদিগের মঙ্গল আমাদিগেরই করতলস্থ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের স্ব স্ব রোপিত নিষ্কাম-কর্ম্ম-বৃক্ষেই সেই মঙ্গল ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা ভাল কর্ম্ম না করিলে কখনই মঙ্গলের আশা করিতে পারি না। এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ঋষিগণের ভূরি ভূরি বচন সংকলন করিতে পারিতাম, কিন্তু অনাবশ্যক ও গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও ব্যোম; এই পঞ্চভূতে জগতীয় যাবতীয় জড় পদার্থ উদ্ভূত হইতেছে। আমরা

নিজে এবং আমাদিগের খাদ্য পরিধেয় ব্যবহার্য্য সমস্ত বস্তুই ঐ পঞ্চভৌতিক। এই সকল পদার্থ পরমাণু সমষ্টি মাত্র। ঘটনা চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া অথবা অনন্ত কাল-সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়িয়া পরমাণু সমষ্টি একত্রীকৃত হইলেই এক এক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রূপে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ; এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী এবং ভূধর, জলধরাদি স্থাবর জঙ্গম চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের সংযোগের নাম সৃষ্টি ও বিয়োগের নাম নাশ বা প্রলয়। কিন্তু এই সৃষ্টি নাশে পরমাণুর ধ্বংস নাই। মনে কর একখানি পুস্তক উক্ত পঞ্চভৌতিক পরমাণু পুঞ্জের সমষ্টিতে প্রস্তুত হইয়াছে, পুস্তক খানি কোন রূপে পুড়িয়া গেলে উহার আর বর্ত্তমান আকার পরিদৃশ্যমান হইবে না সত্য বটে, কিন্তু তাহার পরমাণু ধ্বংস হইল না। তাহার জলীয় ভাগ জলে, মৃত্তিকার ভাগ স্থলে, তেজ ভাগ তেজে, এবং বায়ু ও আকাশের অংশ বায়ু ও আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক সজীব কি নির্জ্জীব, চেতন বা অচেতন সমস্ত জড় পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে।

মানব-লীলার আধ্যাত্মিক ভাবের অভিনয় প্রদর্শন ও তাহার চিত্রাবলি প্রকাশ করাই আমাদিগের মূল উদ্দেশ্য, একারণ আমরা অপর অপর বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মানব লইয়াই ব্যস্ত হইলাম।

আত্মা ও দেহ এই দুইয়ের মিশ্রণে মানবের উৎপত্তি। আত্মা স্বর্গীয় চিদ্বস্তু, আর শরীর পার্থিব জড় পদার্থ। দিব্য চিদ্দ্রব্য কি? তাহার স্বরূপ তত্ত্ব, আর কি কারণে সে মর্ত্তে আসিয়া জড়ের সঙ্গে যোগ দিয়া মরিতে বসে, তদ্বিস্তারিত পরিশিষ্টে বিবৃত হইয়াছে। পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার তথায় গমন করত আত্মা সাক্ষাৎকার লাভে আত্মতৃপ্তি সাধন করিবেন। মানব বিগ্রহ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধীয় স্থূল কথা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সকলই পঞ্চভূত-ময়; মোটা কথায় মাটী হইতেই সকলের উৎপত্তি। আমরা যাহা আহার ও পান করি, সেই ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ রস, পরে রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমে নারীর রজো ও পুরুষের বীর্য্য, এই উভয় পদার্থের সংযোগে

নারীজাতি গর্ভধারণ করে। পুরুষ সংসর্গেই মহিলাগণের গর্ভধারণ স্বাভাবিক হইলেও কখন কখন কোন কোন মহিলার কোন সিদ্ধ-পুরুষের বর প্রভাবে গর্ভ হইতে দেখা গিয়াছে। পুরাণে কোরাণে ও বাইবলে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। বহু কালের কথা দূরে থাক্, এখনও চারিশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বর প্রভাবে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃদুহিতা বিধবা নারায়ণী গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। সেই পুত্রের নাম বৃন্দাবন দাস। তিনি চৈতন্য ভাগবত নামক অদ্ভুত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলী ইহাঁকে ব্যাসাবতার বলিয়া থাকেন। কোন কোন পুত্রাকাঙ্ক্ষিনী কামার্ত্তা দুই স্ত্রীলোকের পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গনেও কাহারও কাহারও গর্ভ হইয়াছে। ভগিরথ এইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর স্বপ্নে যেন পুরুষ সংসর্গ হইতেছে, এরূপ দেখিয়াও কচিৎ কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া থাকে। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

কোন কোন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বন্ধ্যা থাকেন; তাঁহাদের সন্তান হয় না, কিন্তু কোন

কোন দৈবকার্য্য দ্বারা তাঁহারা পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ ও তন্মহিষীগণ দৈবকার্য্য দ্বারা পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের ১২ বৎসর বয়ক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রজঃ নিঃসারিত হয়। তারপর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। রজো নিবৃত্তি হইলে আর সন্তান উৎপত্তি হয় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ও দৈববলে অনেক সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় কার্য্য সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন স্ত্রীর গর্ভ ও সন্তান হইয়াছে। প্রায় শত বৎসর বয়সে ইব্রাহিম পত্নী সারা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। স্ত্রী সহবাস ব্যতিরেকে এবং নারীর গর্ভ বিনাও কোন কোন পুরুষের সন্তান জন্মিয়াছে। ভরদ্বাজ মুনির বীর্য্য স্খলিত হইলে তিনি তাহা দ্রোণিতে রাখিয়া দেন, তাহাতে দ্রোণি মধ্যে সন্তান জন্মে। দ্রোণিতে উদ্ভব বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ হয়। কৌরব গৌরবস্থান দ্রোণাচার্য্য বিখ্যাত যুদ্ধ বীর ছিলেন। পার্ব্বতী সহ-বাসে পশুপতি মহাদেবের বীর্য্য স্খলিত হয়। আদ্যা-

শক্তি ভগবতী হৈমবতী শিবের সেই মহাতেজ ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া গঙ্গা-নীরে নিক্ষেপ করেন। গঙ্গাও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তরঙ্গ দ্বারা শর-বনে ফেলিয়া দেন। তথায় সেই শিব-শুক্রে দেব সেনাপতি শক্তিধর কার্ত্তিকেয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি কৃত্তিকা প্রভৃতি ষট নক্ষত্রের স্তনপান ও ষড়মুখ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় ও ষড়ানন হইয়াছে। জনক রাজার রেতঃপাত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে স্বয়ং লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী সীতা নাম্নী কন্যা জন্মেন। মৃগয়া করণ কালে উপরিচর রাজার শুক্র নির্গত হয়, তাহাতে তিনি শ্যেন পক্ষী দ্বারা আপন ঋতুমতী ভার্য্যা সমীপে তাহা প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে গগণবিহারী অন্য শ্যেন প্রথমোক্ত শ্যেনের চঞ্চুপুটে কোন খাদ্য দ্রব্য আছে বিবেচনা করিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে, পক্ষী মুখ হইতে সেই বীর্য্য জলমধ্যে পড়িয়া যায় এবং তাহা এক মৎস্যে ভক্ষণ করে। এই বীর্য্য ভোজনে সেই মীনের গর্ব্ভসঞ্চার হয়। সেই মৎস্য গর্ভে আমাদিগের বেদ বিভাগ কর্ত্তা সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা মহামুনি ব্যাসদেবের

মাতা মৎস্যগন্ধার উদ্ভব হইয়াছিল। অবিবাহিতাবস্থার কুন্তী দেবী সূর্য্যসমাগমে গর্ভিনী হইয়া দিবাকরের প্রভাবে কর্ণ বিবর দিয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কর্ণ হইতে উৎপত্তি বলিয়া কুন্তীর কন্যকাবস্থার পুত্রের নাম কর্ণ হয়। আর একজন পুরুষ ইলা রাজা বুধ সহবাসে গর্ভধারণ ও পুত্র প্রসব করেন। মহাভারত দেখ।

মানব জাতীয় কোন কোন মহিলার গর্ভে মূক, বধির, অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ প্রভৃতি নানা বিকলাঙ্গ সন্তান সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার কারণ ও কয়েকটী চিত্র পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গিয়াছে।

মানবী গর্ভ হইতে সর্প, পক্ষী ও বানরাদিও উৎপাদিত হইয়াছে। মহর্ষি কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী বিনতার গর্ভে গরুড়পক্ষী ও কদ্রুর উদরে নাগ গণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা পৌরাণিক আখ্যান, কিন্তু সম্প্রতি নবদ্বীপ বাসী বিখ্যাত কংসবণিক গুরুদাসের সহধর্ম্মিণী লাঙ্গুল হীন বানরের ন্যায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। গুপ্ত গৃহ নামক পুস্তক প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার শ্বশুর কুলের এক স্ত্রী সর্প

প্রসব করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার শ্যালকেরা কোন সর্পের নিধন দর্শন করিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখন অস্বাভাবিক গর্ভ ও অস্বাভাকি সন্তান উৎপাদন বিষয় অধিক বর্ণনা না করিয়া স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গর্ভধারণ এবং স্বাভাবিক সন্তান উৎপাদন বিষয়ে কিছু বলিব।

স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ কাল দশমাসই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন গর্ভিণী সাত মাসে, কেহ কেহ আট মাসে ও কেহ কেহ বা নয় মাসে পুত্র প্রসব করিয়া থাকেন। যে সকল সন্তান সাত মাসে জন্মে, তাহারা বাঁচিয়া থাকে না। আট মাসে যে সকল সন্তান সন্তো ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা-দিগকে আটাশে ছেলে বলে, কিন্তু অনেক আটাশে ছেলে দীর্ঘজীবী হইয়াও থাকে। কোন কোন সন্তান এক বৎসর, কেহ কেহ বা দেড় বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। শুকদেব অষ্টাদশবৎসর মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। প্রসূতীর এক বারের গর্ভ হইতে এককালে একটী সন্তান প্রসবই

প্রথম মাস

শোনিত শুক্র সংযোগে গর্ভসঞ্চার বা জীবের দেহাঙ্কুর

দ্বিতীয় মাস

তৃতীয় মাস
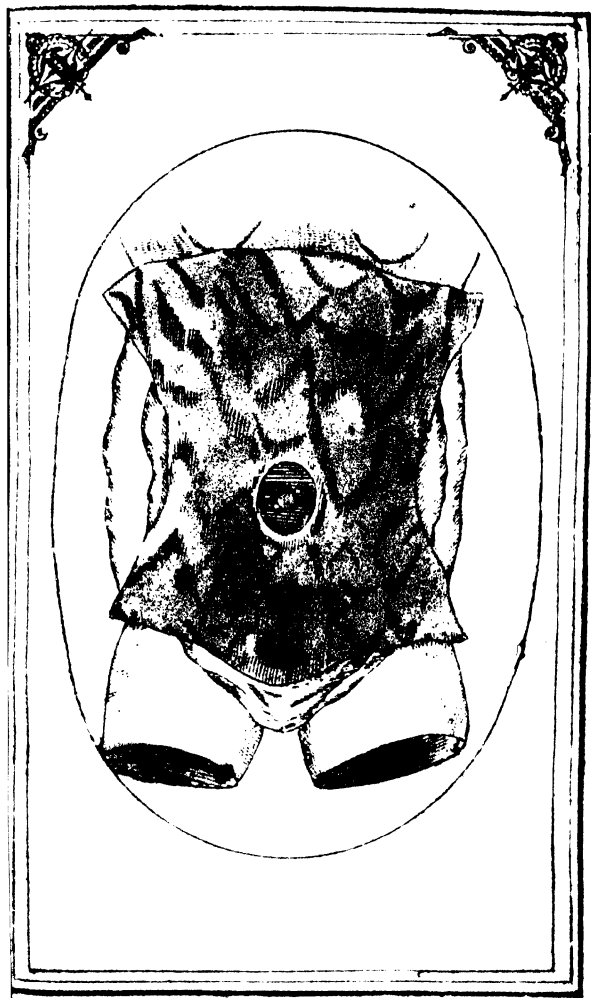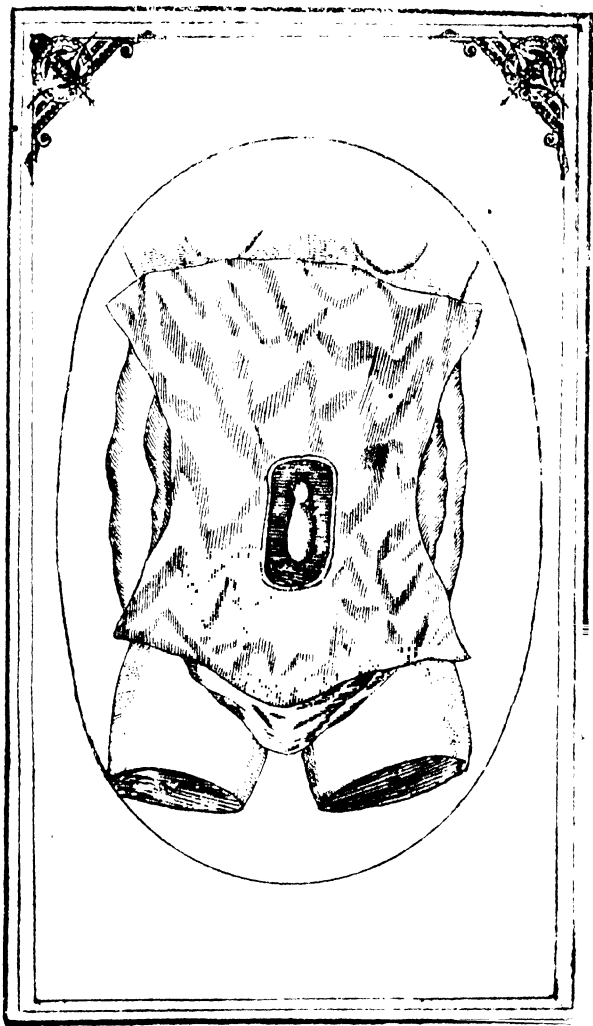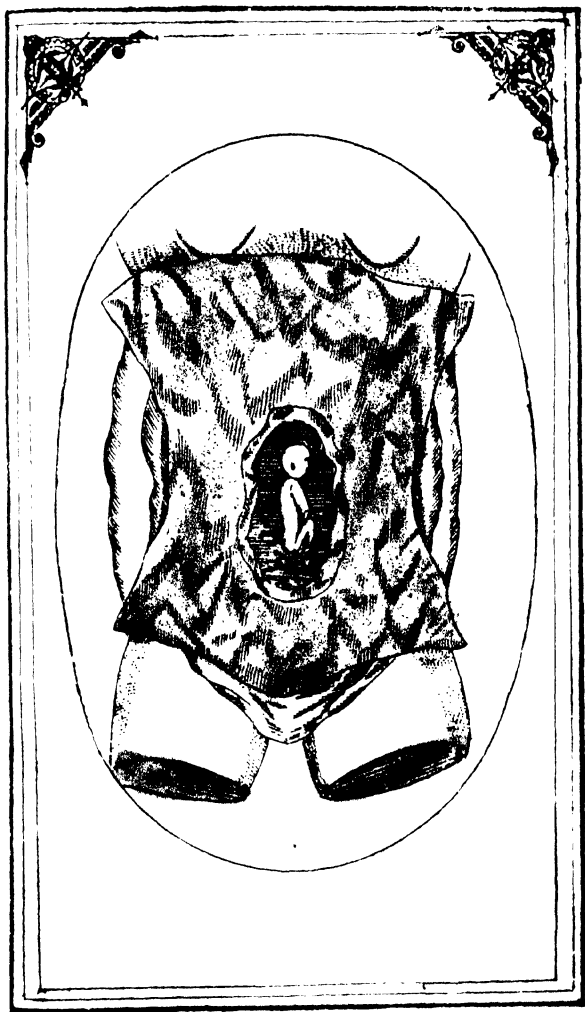
স্বাভাবিক, কিন্তু কখন কখন গর্ভিনীর একবারের গর্ভ হইতে ২।৩।৪।৫।৬ ও ৭টী পর্য্যন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা গিয়াছে।

যাহা হউক স্ত্রীলোকে গর্ভধারণ করিলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান দশ মাস কি ভাবে গর্ভ মধ্যে অবস্থান করে, তাহার সবিশেষ বিবরণ সহিত চিত্র সকল এ স্থলে দেখান যাইতেছে।

স্ত্রী পুরুষের শোণিত শুক্র মিলিত হইয়া তাহা প্রথম দিবসেই অর্থাৎ গর্ভ ধারণ দিনেই স্ত্রীর [illegible] দ্বারা পরিবেষ্টিত ও রুদ্ধ হইয়া পাঁচ দিনে বুদ্বুদাকার অর্থাৎ বর্ত্তুল প্রায় জলবিম্ববৎ হয়। পরে ক্রমশঃ মাংসপেশী রূপে পরিণত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় মাসে উহা অঙ্কুরিত হইয়া বিম্বফলাকার ধারণ করে। তৃতীয় মাসে মস্তক, শরীর, বাহু উরু ও পাদাদি অতি অপরিস্ফুট রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাকে ছাঁচ বাঁধা বলে। এখন ইহা জড় বস্তু। চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ জীবের অবয়ব কিছু পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পায়। পঞ্চম মাস হইতে জীব সঞ্চার হয়। এখন হইতে এই জীবের অপরিস্ফুটরূপে কিছু ক্ষুৎ পিপাসার উদ্রেক

হইতে থাকে। এই সময়াবধি গর্ভস্থ প্রাণী মাতার অমৃত প্রবাহিনী নাড়ী চোষণ পূর্ব্বক মাতৃরস পান করত প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। এই কালে মাতাও পঞ্চামৃতাদি পান ও অভিলষিত সুখাদ্য আহার করত ভ্রূণের পুষ্টিবর্দ্ধন করেন। এখন জীব যেন গর্ভমধ্যে বিশেষ নির্জ্জন স্থানে যোগাসনে বসিয়া যোগ সাধন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মাসে ক্রমান্বয়ে গর্ভস্থ সন্তান সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া গর্ভের ভিতর নাড়িতে চাড়িতে থাকে। নবম মাসে যেন হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছে। গর্ভ এরূপ আবরণে আচ্ছাদিত, যে তন্মধ্যে সন্তান ক্রন্দন পর্য্যন্তও করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ মহান্ মহেশ্বর, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম নিজ অধীনেই রাখিয়াছেন, তিনি কখন তাঁহার সৃষ্ট নিয়মের অধীন নহেন, ইহা জগতকে দেখাইবার কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, যখন আমার মাতুল ব্রহ্মদেশের থাএটমিউ নগরে একজন রাজকর্ম্মচারি ছিলেন, সেই সময়ে উক্ত নগরস্থ নবম মাস

পঞ্চম মাস

ষষ্ঠ মাস

সপ্তম মাস

পঞ্চম মাস
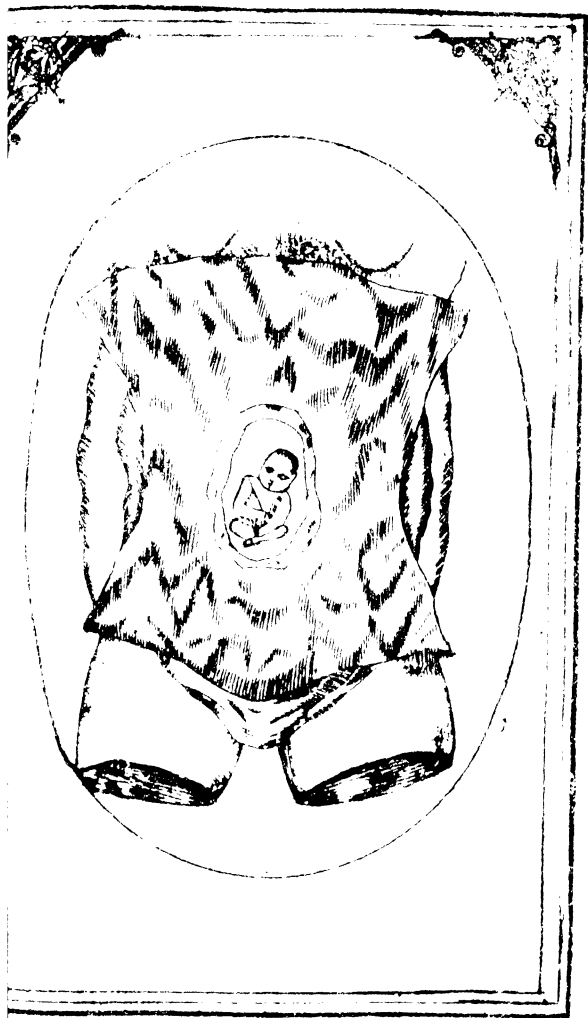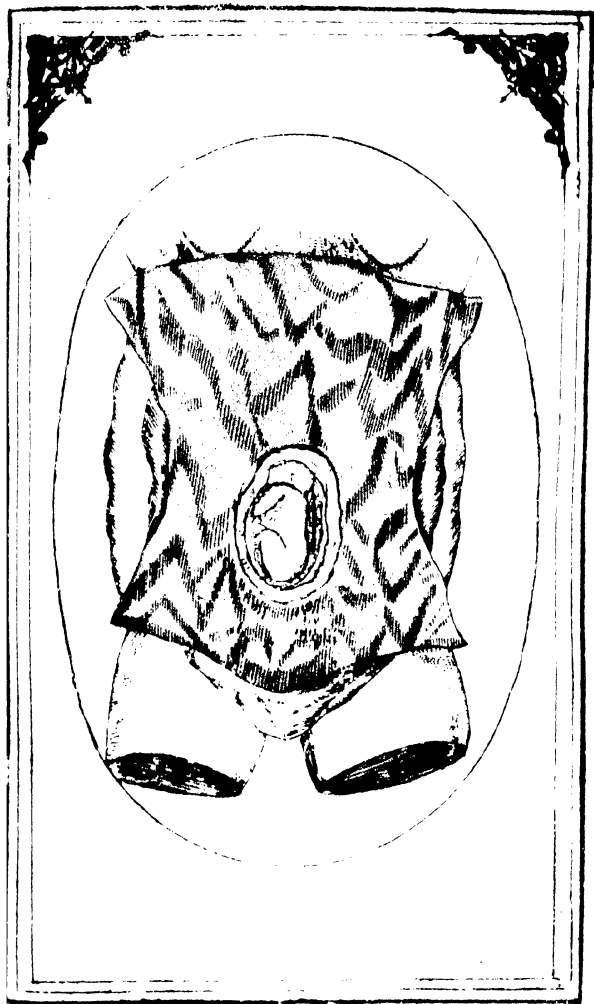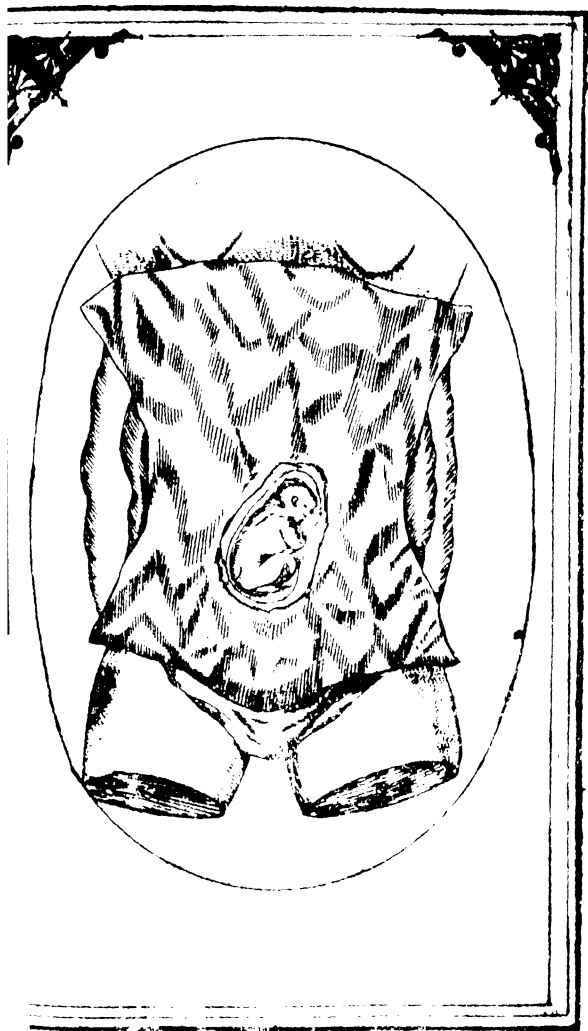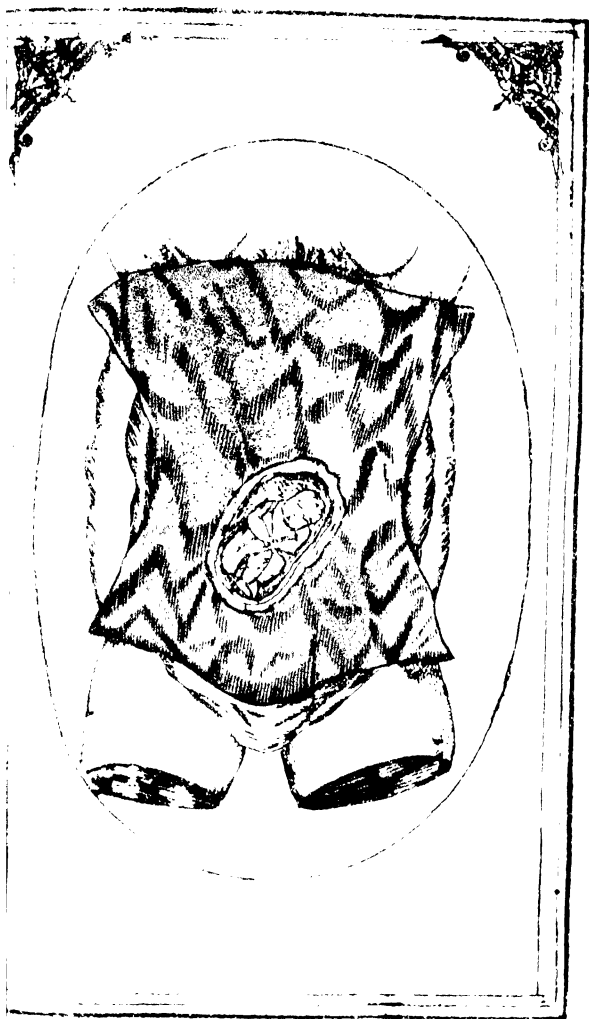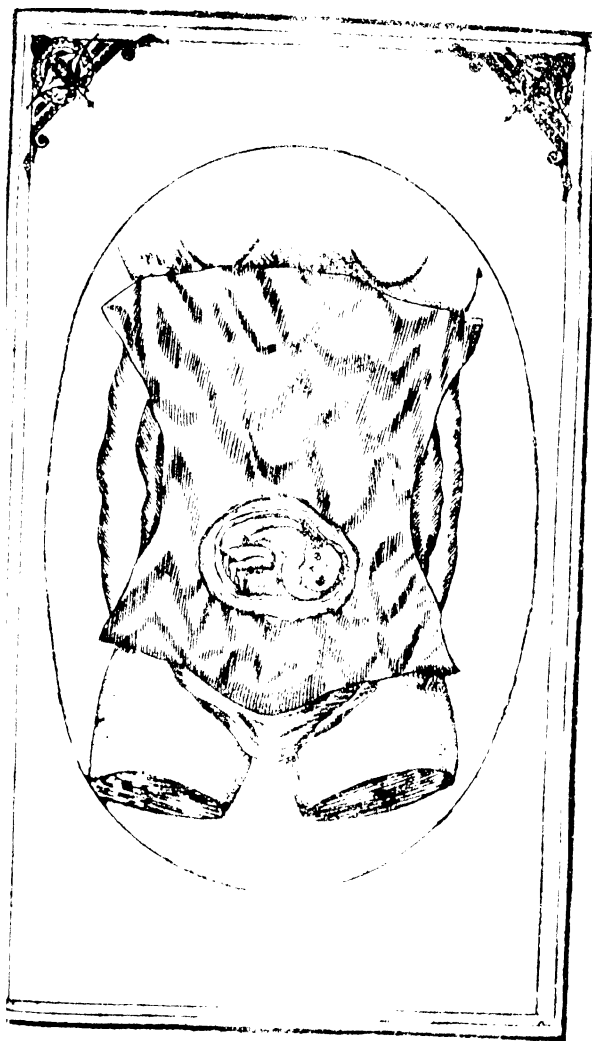
গর্ভবতী এক স্ত্রীলোকের গর্ভ মধ্যস্থ সন্তানটী মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিত। এ বিষয় আমি তাঁহার প্রেরিত পত্রে অবগত হইয়াছিলাম। এবং এই আশ্চর্য্য সত্য সংবাদটী তৎকালীন সমাচার পত্র সকলে প্রকাশিতও হইয়াছিল। নবম মাসে গর্ভবতী আর্য্য রমণীরা যে সাধ ভক্ষণ করেন, এ ধর্ম্মসঙ্গত নিয়ম অতি উপাদেয়, এতদ্দারা গর্ভস্থ জীবের ঐহিক পারমার্থিক উভয় উপকার লাভ হইয়া থাকে। কারণ মাতার মনের আহ্লাদ ও পরমার্থ ভাব সকল গর্ভস্থ সন্তানেই প্রতিফলিত হয়। এ জন্য গর্ভাবস্থায় গুর্ব্বিনীকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তা ও উচ্চভাব সকলের চর্চ্চা করিতে হয়।

দশমমাসের গর্ভস্থ জীব যেন ঊর্দ্ধ পদে হেঁট মাথে তপস্যা করিতেছে, ও জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্ম সকল স্মরণ করত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পরতত্ব চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইয়া থাকে। সেই সময়ে যেমন সন্তানের চক্ষু ফুটিয়া উঠে, অমনি সে ঐ অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও কোন কোন সন্তানের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

প্রসূতীর পক্ষে পুত্র প্রসব করা পরম মঙ্গলালয় দয়াময় পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহাতে প্রসব বেদনাদি কোন কষ্টের কারণ নাই। অনেক শ্রমজীবী ইতর রমণীরা কর্ম্ম করিতে করিতে অক্লেশে পুত্র প্রসব করে। অতএব গর্ভাবস্থায় পরিমিত মত সংপরিশ্রম করা ভদ্র-মহিলাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অবশ্যই প্রসব বেদনার লাঘব হইবে। তবে যে সচরাচর স্ত্রীলোকদের ভয়ানক প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, কোন কোন কামিনী পুত্র প্রসব করিতে না পারিয়া সগর্ভ প্রাণ ত্যাগ করে, আর কোন কোন সন্তান যে ভূমিষ্ঠ হইতে না পারিয়া গর্ভ কারাগারেই মরে, ইহা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘন ও পাপের ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই। মৃত্যু যন্ত্রণাপেক্ষা জন্মগ্রহণের যাতনা, সাক্ষাৎ নরক যন্ত্রণা বলিয়াই বোধ হয়। এই জন্য এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে কোন জ্ঞানবানই ইচ্ছা করেন না; জন্মিলেও আর যাহাতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, ভক্তিযোগ সাধনাদি দ্বারা তাঁহারা তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া এইরূপে

দশম মাস

মরণ চিন্তা করিয়া থাকেন। কোন সাধু বলিয়াছেন। যখন আমি কোন বিষয়ে অপরাধী হই, আর যদি শুনিতে পাই যে পুলিসের কর্ম্মচারিরা আমাকে ধৃত করিতে আসিতেছে, তখন আমার মনের ভাব কি রূপ হয়, ভয়ে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়, মুখ ম্লান হইয়া যায়, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, স্বেদজল নির্গত হইতে থাকে। কোথায় পলাইলে, আপাততঃ এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, মনে মনে এরূপ ভাবনাও হইয়া থাকে। তখন কেবল আমার নিজের এই ভয় ও মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা হয়, তাহা নয়, আমার পরিবারবর্গও ঐ ভয় ও মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার অংশীদার হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারাও পর্য্যন্ত আমার বিপদের ও তন্নিবন্ধন তাহাদের, তাহার আংশিক আপদের প্রতিকারে যত্নবান হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ফাঁশীর আসামী, তাহার ধরা পড়িবার অথবা তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্বে তাহার ও তাহার পরিজনের মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা ভুক্ত ভোগী ব্যতীত কেহই অনুমান করিতে পারে না। রাজদ্বারে সামান্য শাস্তি বা প্রাণদণ্ড ভয়ে লোকে আহার নিদ্রা

পরিত্যাগ করিয়া অতি ব্যাকুলতা ও কাতরতা প্রকাশ করে, কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে মাদৃশ পাপী লোক-দিগকে যমদূতেরা যে নানা ব্যাধি যন্ত্রণা দ্বারা মৃত্যু-গ্রাসে পাতিত করিবে, তারপর কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে হইবে, এ ভাবনা আমাদের মনেই আসে না। নিশ্চিন্ত ও নির্ভাবনায় কি রূপে আহার বিহার করি, বুঝিতে পারি না। আমাদের আত্মার এই অসাড়তা রোগ সর্ব্বনাশের মূল। ইহা কুষ্ঠব্যাধি অপেক্ষাও মহা ভয়ানক! কুষ্ঠ রোগের যাতনা নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে অঙ্গ ক্রমে ক্রমে পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে বলিয়া, রোগী তৎপ্রতিকারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আত্মার এই বিবেক বৈরাগ্য রহিত অচৈতন্য ভাবরূপ মহারোগে মানবের স্বকীয় শরীরে কোন যন্ত্রণা বোধ না হওয়ায় মানুষ তজ্জন্য কাতরতা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না, ও তৎ প্রতিকারের চেষ্টায়ও থাকে না, ইহাই মূর্খ ও পাপী লোকের স্বভাব। জ্ঞানবান সাধু মনুষ্যেরা তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা অপর লোকের বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু দশা অবলোকনে আপনারা সাবধান হয়েন। এখন কথা এই, মাদৃশ অচেতন পাপিদের

পক্ষে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? যাহাতে পাপ ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ভয়ে আমরা কাতরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারি; আইস আমরা সকলে তদর্থে সবিশেষ চেষ্টা ও দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট ব্যগ্রতা সহকারে সরল মনে প্রার্থনা করি।

ঈশ্বরের অনন্ত সৌরজগৎ অর্থাৎ জড় পৃথিবী, ভগবানের আনন্দময় চিন্ময় রাজ্য সম্বন্ধে এক একটী দ্বীপান্তর স্বরূপ। যেমন পার্থিব রাজগণ অপরাধিদিগকে দোষের তারতম্যানুসারে কাহাকে কাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করেন এবং কাহাকেও বা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিয়া আবদ্ধ রাখেন, তদ্রূপ জগদীশ্বরের চিন্ময় রাজ্যের পাপী প্রজারা পাপের তরতম অনুযায়ী নরকরূপ সংসার দ্বীপে দ্বীপান্তরিত ও দেহ কারাগারে আবদ্ধ অথবা গর্ভ কারাকূপে বন্দী হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি পুরাণ সকলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবানের চিন্ময় রাজ্যের কোন প্রাণী পাপ করিলে, কি কাহার নিকট কোন অপরাধ করিলে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কুকর্ম্মের দণ্ড ভোগ করিবার জন্যে

দ্বীপান্তর স্বরূপ নানা জড় জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সকল চিজ্জীব কেবল মনুষ্য হইয়া জন্মে তাহা নহে, তাহারা বৃক্ষ, শিলা, কুম্ভিরাদি অশেষ বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকে।

গৌতম মুনির শাপে তৎসহধর্ম্মিণী অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। গন্ধকালী নাম্নী দেবকন্যা দক্ষ মুনির শাপে কুম্ভিরিণী হইয়া জন্মেন। বসুদেবগণ যখন বশিষ্ঠ ঋষির কপিলা হরণ করেন, তখন বশিষ্ঠ অষ্ট বসুকে পৃথিবীতে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ কর বলিয়া অভি-সম্পাত করিয়াছিলেন। তাহাতে বসুদেবগণ শাপ মোচনের প্রার্থনায় মুনির চরণে পড়িয়া অনেক কাকুতি মিনতি করেন, এবং বলেন, "মুনিরাজ! আমরা কুম্ভীপাকাদি ঘোরতর নরক যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মাতৃ-গর্ভবাস রূপ অকথ্য দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে আমরা কখনই পারিব না" ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সংসার একটী ভয়ঙ্কর নরক কুণ্ড।

পাপী ও অপরাধি জীবেরা এই নরককুণ্ডে আসিয়া আপন আপন দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।

দেহীর গর্ভেও নিস্তার নাই

তথাপি মাদৃশ পাপিদের চৈতন্য হয় না, ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। অনেক পাপীকে পৃথিবী দর্শন করিতে হয় না, তাহারা বারবার গর্ভে জন্মিয়া গর্ব্ভ মধ্যেই মরে। কোন কোন মানুষ দশমাস কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না। একটী পূর্ণ গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকের দারুণ প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, ৩।৪ দিন নানা চেষ্টা করিয়া কোন ক্রমেই তিনি পুত্র প্রসব করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাক্তার আসিয়া গর্ব্ভিণীর গর্ব্ভ মধ্যে সশস্ত্র হস্ত প্রবেশ করিয়া দিয়া পেটের ছেলেকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বাহির করেন। ডাক্তার গুণপুরুষ ভ্রূণ কাটিতে কাটিতে অসাবধানে অন্তর্ব্বত্নীর অন্ত্রনাড়ি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে লোম হর্ষণ রক্ত-প্লাবন উপস্থিত হয়। আর গর্ভিণী কাটা ছাগলের ন্যায় ছটফট ও বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করে।

গোলোকবাসীদের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ, আর তাহার সহিত ভূলোকের অতি অপবিত্র বিষ্ঠাভোজী শূকরের অবস্থা

তুলনা কর। শূকর মাংসাশিরা শূকরকে কেমন দগ্ধ করিয়া ও অস্ত্র দ্বারা মহা ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া মারে, তাহা অবলোকন করা দূরে থাক, শ্রবণ বা স্মরণ মাত্রেই আত্মা পুরুষ আতঙ্কে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এ সকল বিভৎস ব্যাপার কি আকস্মিক ঘটনা? দয়ার সাগর স্নেহের উৎস, ক্ষমার খনি, পরিত্রাণের মণি পরমেশ্বরের ন্যায়রাজ্যে কি এ সকল নিষ্ঠুর ও অন্যায় কার্য্য সম্ভবে? কখনই না। তবে নিশ্চয় জানিও উহা কঠিন পাপের গুরুদণ্ড।

পৃথিবী পাপীর শাস্তি ভোগের দ্বীপান্তর বা কারাগার হইলেও এই জন্মভূমি কর্ম্মভূমি বলিয়া কথিত হয়, এবং ইহা অতি সুন্দর শিক্ষা ও সংশোধন স্থান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান মঙ্গলময়। তিনি আমাদের মঙ্গলোদ্দেশেই আত্ম উৎসর্গ করিয়া কায়ব্যূহ ধারণ পুরঃসর বিবিধ প্রকারে আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি কি মাদৃশ পাপীদিগকে কেবল যন্ত্রণা দিবার কারণ ঐ সকল দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করিতেছেন? তাহা নয়, তাঁহার শান্তি জনক শাস্তি আমাদের পরম মঙ্গল সাধন

করিয়া থাকে। তাঁহার সকল বিধি ব্যবস্থা ও ঘটনা আমাদের মঙ্গলোদ্দেশেই নিয়োজিত আছে।

পার্থিব রাজগণের কারাগারে যেমন বন্দী ভিন্ন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসন পালন জন্য রাজকর্ম্মচারীরাও নিযুক্ত থাকে, তেমনি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বীপান্তর অথবা কারাগার স্বরূপ এই পৃথিবী কেবল পাপীদের বাসস্থান নহে, এখানেও মাতা পিতা গুরু ও ভক্ত সাধুগণ পাপী লোকদের লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ শিক্ষা শাসন ও পরিত্রাণ করিবার কারণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। পার্থিব পিতা মাতা হইতে ঈশ্বর যত মহান্, আমাদের প্রতি তাঁহার করুণা ততই মহত্তর, মহত্তর হইতেও মহত্তম। ঈশ্বর গর্ভ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহার অসীম স্নেহের বিষয় ও তাঁহার প্রতি আমাদের কিরূপ ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা জগতে নাই। অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রাকৃত ভাষায় কণামাত্রও ব্যক্ত করা যায় না।

মানবের গর্ব্ভবাসাবস্থা আমরা পাঠককে দেখাইলাম। শাস্ত্রে বলেন, গর্ভবাস, যোগভাব ও প্রেতা-

বস্থায় জীব তিন কালের ঘটনা সকল জানিতে পারেন। সে স্থান কর্ম্মক্ষেত্র নহে, তথায় কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না।

গর্ভমধ্যে সদাচারী ব্যক্তির যাতনার লাঘব হয়। ঋণ, পিতৃঋণাদি না থাকিলে জীব গর্ভস্থলি মধ্যে প্রায় যোগাবল্যে নিদ্রিত থাকেন। সময়ে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের কুৎসিত কর্ম্মের জন্য যে যাতনা দায়ক ফল পাইতে হইবে তজ্জন্য অনুতাপ করেন।

দুরাত্মারা গর্ভস্থলিতে প্রায়ই জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়া, আপনাদের কৃত কুকর্ম্ম জন্য যে অনিবার্য্য দারুণ কষ্টদায়ক ফল ভোগ করিতে হইবে তাহার অনুশোচনায় দাহ্যমান হইয়া অনবরত উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে, যথা।

ঈশ্বর দত্ত হস্ত পদাদি নানা ইন্দ্রিয় ও বল বুদ্ধি এবং বৈভব দ্বারা অশেষ সুখ ভোগ করিয়াছি বটে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেনইবা ভোগে মত্ত হইয়া তাঁহার আরাধনা ও অর্চ্চনা করি নাই, তজ্জন্য আমি নরক গামী হইলাম। অন্নাভাবে লালায়িত হইয়া আমারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে।

একাধিক্য গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা
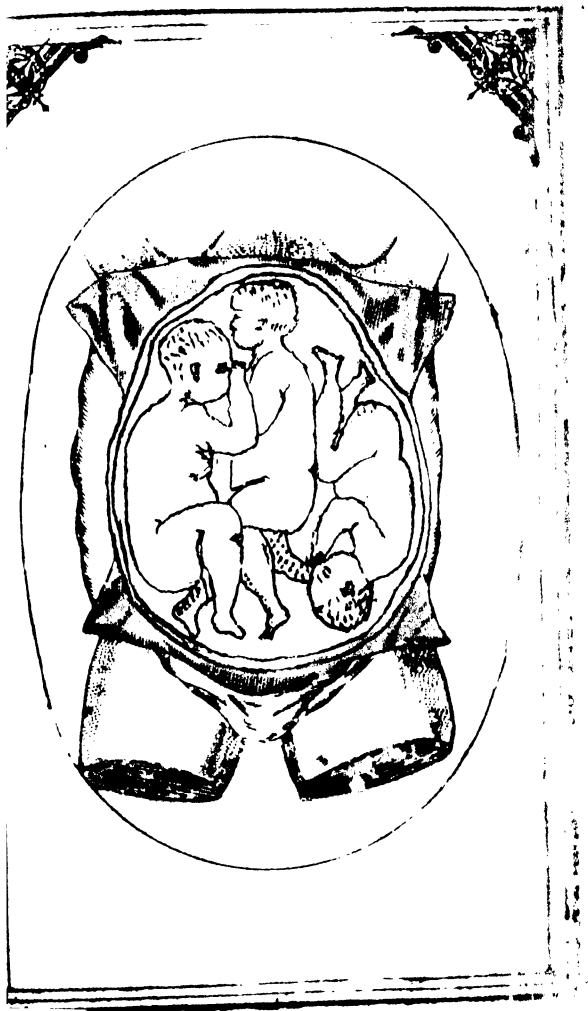
হায়! আমি কুসঙ্গ দোষে খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া, বংশ মর্য্যাদা ও পবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে আহার বিহার করিয়াছি। তজ্জন্য হেয় বংশে জন্মিয়া জঘন্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, আর আমাকে কেহ স্পর্শ করিবে না এবং আমাকে চির রোগী হইয়া থাকিতে হইবে।

হায়! যে মাতা নানা কষ্টে আমাকে গর্ভে ধারণ ও লালন পালন করিয়াছেন, হত জ্ঞান হইয়া আমি তাঁহার সেবা করি নাই, প্রত্যুত তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে মহারোগ গ্রস্ত হইয়া নানা যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

হায়! যে পিতা আত্ম সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, আমি তাঁহার পিণ্ডদান করিব, কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিব, এই অভিপ্রায়ে আমার হিতোদ্দেশে কত যত্ন কত কষ্ট ভোগ ও কত শ্রম ও কত ব্যয় করিয়াছেন, আমি সেই পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করি নাই, বরং তাঁহাদের ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করিয়াছি, তাঁহা-দিগের ঋণ শোধ না করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতে চলিলাম! দেব ঋণ ও পিতৃ ঋণ দায়ে জন্মায়ু

... লোক ... ... হইতেছে না। ... আর
... নাই!

হায়! কেন বিচার স্থলে জানা কথা গোপন
করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি আজন্ম মূক হইয়া থাকিব।

হায়! কেন গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করিনাই ও
...ধিত দুঃখি লোককে কেন অন্ন দিই নাই, তজ্জন্য
আমাকে পুত্র শোক পাইতে হইবে।

হায়! কেন গর্ভপাতের যন্ত্রণা দিয়াছি ...
... হত্যা করিয়াছি, তজ্জন্য বারম্বার গর্ভপাতেই
...মার মৃত্যু হইবে, আমারে কেবল গর্ভে ... ভ্রমণ
করিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগের একশেষ করিতে হইবে।

হায়! কেন প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা পূর্ব্বক পর
... লইয়াছি, চুরি ডাকাতি করিয়াছি, তজ্জন্য রুগ্ন ও
...হীনাঙ্গ হইয়া রাস্তার ধারে ভিক্ষোপজীবী হওত
...মি নানা কষ্ট প্রাপ্ত হইব ইত্যাদি।

সূতিকাগার

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মানবের বাল্যাবস্থা।

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ অবস্থায় অবস্থান করেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব।

ঐ দেখ সূতিকা গৃহে প্রসূতি পুত্র প্রসব ক[illegible] লেন। কি বিস্ময় জনক ব্যাপার! কোথায় নির্ব্ব অন্ধকার ময় সংকীর্ণ স্থানে বন্দী ছিলাম, আর এক্ষ কোথায় সৌর জগতের জ্যোতি বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহি সুপ্রশস্ত স্থানে আসিয়া পড়িলাম, এ আবার কি, এই ম[illegible] ভাবিয়া শিশু ত্রাসযুক্ত হইয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। অভ্যস্ত বিষয় সকলকারই ভাল লাগে। দশমা[illegible] গর্ভ মধ্যে থাকিয়া সে স্থান এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছিল, এখন সহসা নূতন স্থলে উপস্থিত হইয়া শিশু ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভগবৎ মায়া আসিয়া

উঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। যে মায়ার মোহিনী জালে বদ্ধ হইবার ভয়ে শুকদেব গোস্বামী দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আজি সেই মায়া জালে আমাদের নবীন শিশু অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শিশুরূপী ভেকের পদ দুটি কালরূপী মহানাগ আসিয়া গ্রাস করিয়া বসিল। কালভুজঙ্গ এখন যথাসাধ্য আস্তে আস্তে অথবা শীঘ্র শীঘ্র উঁহারে উদরস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকেই কালের উদরে জীর্ণ হইয়া যায় বটে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকে আপনাদের বিবেক ও চৈতন্য প্রভাবে কালসর্পের মুখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই মুক্ত পুরুষ, ইহাঁদের উপর যমের কোনই অধিকার নাই। ইহাঁরা ইচ্ছামত সশরীরে অথবা ইচ্ছানুসারে দেহ রাখিয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রহ্লাদ [illegible] গোস্বামী, বুদ্ধ দেব, গৌরাঙ্গ দেব, তুলসিদাস, রঘুন[illegible] দেব [illegible] রূপ সনাতন প্রভৃতি অশেষ জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ [illegible] দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপ আছেন।

এখন সদ্য [illegible] শিশুটী পুট পুট করিয়া মাতৃমুখ নিরীক্ষণ [illegible] আর চঞ্চল চক্ষে এক এক বার সূতিকাগারের [illegible] দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-

তেছে। ঐ দেখ এক দৃষ্টে জ্বলন্ত প্রদীপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে জননীরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাসিতেছে। মাতা সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইলেন, শিশু দুগ্ধ পান করিবে বলিয়া মাতৃ স্তন অন্বেষণ করিতেছে। মাতা পুত্রের মুখে স্তন প্রদান করিলে সে অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। এ শিশুটীর এ নূতন জন্ম নহে, ইহার পূর্ব্ব জন্ম ছিল, সেই সংস্কার বশে আমাদের এই নবীন শিশু অনায়াসে মাতৃ স্তন পান করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য মধ্যে অনেক শিশুর নূতন অর্থাৎ সেইবার তাহার প্রথম জন্ম হয়। পূর্ব্ব সংস্কার না থাকাতে মাতৃ স্তন পান করিতে তাহাকে আয়াস পূর্ব্বক শিক্ষা দান করিতে হয়।

সদ্য প্রসূত শিশুটী একটু একটু হাত পা নাড়ে, পিট পিট ক'রে চেয়ে দেখে, আর এক একবার কাঁদে ও হাসে, তদ্ব্যতীত ইহার নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই। সম্পূর্ণ অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও অক্ষম। এখন ইহার নিজের অস্তিত্ব বোধ নাই এবং ভালমন্দ কিছু জ্ঞানই নাই। কেবল ক্ষুধা ও স্পর্শ বোধ আছে। ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে ক্রন্দন করিতে থাকে, আর শরীরে কিছু আঘাত

বা অসুখ বোধ করিলেও কাঁদিয়া উঠে। সন্তান পালন অতীব গুরুতর বিষয়। এ সময় জননীর বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইলে আর পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় না। এজন্য জননী সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় সূতিকা পূজা সেটেরা পূজা ও ষষ্ঠী আদি পূজা দিয়া থাকেন।

শশিকলার ন্যায় সন্তান এখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাদের নবীন শিশুর এখন দন্ত নাই, দুগ্ধ ভিন্ন ইহার আর কোন খাদ্য অধুনা উপযোগী নহে। দাই রাখিয়া সন্তানকে মাই খাইতে দেওয়া অনুচিত। ধনী লোকেরা এ রূপ করেন বটে, কিন্তু ইহা ধর্ম্ম ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত কর্ম্ম। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার স্তনপান করিবে বলিয়াই ভগবান গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্তনে দুগ্ধেরও সঞ্চার করিয়া দেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা যাহা আহার করি তাহা প্রথমে রস পরে রক্ত হইয়া থাকে। এই রক্ত হইতেই আমাদের শরীরের, প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির গঠন হয়। একারণ পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য পবিত্র হওয়া অতি আবশ্যক, নতুবা অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণকারীর পীড়া ও মন্দ চরিত্র হওয়া অবশ্যই সম্ভব।

শৈশবাবস্থা

রোমীয় বাদসা কালিগুলা বাল্যকালে ধাত্রী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি নীচ প্রকৃতির নীচ জাতীয় ধাত্রির স্তনপান করিতেন। কালিগুলা সর্ব্বদা স্তনপান করিতেন না বলিয়া দাই নিজ স্তনে রক্ত লেপন করিত, তাহাতে লালস্তন দেখিলেই কালিগুলা তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিতেন। একে নীচ জাতীয় হীন বুদ্ধি ক্ষুদ্রমনা ধাত্রির দুগ্ধ, তায় আবার রক্ত মিশ্রিত, ক্রমাগত ইহা পান করিতে করিতে কালক্রমে কালিগুলার বুদ্ধি শুদ্ধি ঐ ধাত্রির মত ক্ষুদ্র হইল এবং তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় হইয়াছিলেন। তিনি রাজকুলে জন্মিলে কি হয়, জাতি ম্লেচ্ছ ও আহার কদর্য্য বলিয়া অতিশয় জঘন্য প্রকৃতির লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রক্ত মাংসাশী সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর ও মদ্য মাংসাশী মনুষ্যের উগ্র ও নিষ্ঠুর স্বভাবের সহিত কেবল তৃণাহারী গবাদি এবং নিরবচ্ছিন্ন হবিষ্যাশী ঋষির শান্তশীল পবিত্র চরিত্র তুলনা করিলে, স্পষ্টই জানা যায় যে আহার দ্বারাই জীবের চরিত্র গঠিত হয়।

যাহা হউক শিশুটী এখন তিন মাস বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে এখন আপনা হইতে উবুড় ও চিৎ হইতে

এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে। দেখিতে দেখিতে শিশু পাঁচ ছয় ও সাত মাস বয়ক্রম অতিক্রম করিল। এখন সে হামা দেয় অর্থাৎ বুকে হাঁটিয়া যায় এবং তাহাকে কেহ বসাইয়া দিলে সে অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে। তারপর সে চারি পায়ে চলে, অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মত হস্তপদে হাঁটিয়া বেড়ায়। এখানে একটী প্রহেলিকা মনে পড়ে— "সকালে চার পায়, দুপুরে দু-পায়, সন্ধ্যায় তিন পায় চলে, বল বুধগণ হেন জন্তু কারে বলে?" উত্তর—মনুষ্য। মানব শৈশবে চারি পদে, পরে দুই পায়, আর বার্দ্ধক্যে যষ্টি লইয়া তিন পায়ে হাঁটিয়া থাকে।

আমাদের নবীন শিশু এখন মা, বা, এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিতে এবং একটু একটু দাঁড়াইতে পারে। শিশু যদি শিক্ষা না পায়, তবে সে কিছু মাত্র কথা কহিতে পারে না, চলিতেও পারে না।

শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পরিণামে মানব কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কারণ একজন রাজা সদ্য প্রসূত দুইটী

বালককে লইয়া এক নির্জ্জন প্রান্তরে এক কুটির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বালক দ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ কারণ যে পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল, রাজা তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, "পরিচারিকে! তুমি মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক শিশু দুটীকে কেবল ভোজন করাইবে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে কথা কহিতে, চলিতে কি বস্ত্রাদি পরিধান করিতে আদৌ শিক্ষা প্রদান করিও না।" রাজার এই আদেশ অবিকল প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এইরূপে ষোড়শ বৎসর অতীত হইলে পর, এক দিন রাজা উক্ত বালকদ্বয়কে সভা স্থলে আনয়ন করিলেন। বালকদ্বয় উলঙ্গ, বস্ত্র পরিতে পারেনা, কিছু বলিতে বা চলিতে পারে না। পারে কেবল হাসিতে ও কাঁদিতে এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার বেক বেক শব্দ করিয়া উঠে। সভাসদগণ অনুমান করিলেন, কোন খেচর পক্ষীর রব শ্রবণ করিয়া বালকদ্বয় এরূপ শব্দ করিতে শিখিয়াছে।

বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখিত আছে। পাটনার পূর্ব্বতন কমিশনর প্যাটন সাহেব একদা মৃগয়া করিতে গিয়া একদল নেকড়ে বাঘ দেখিতে পাইলেন। বাঘের পাল অবলোকন

মাত্র সাহেব বন্দুক ছুড়িলেন, তাহাতে ব্যাঘ্রগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু একটী আর পলাইতে পারিল না। সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন ধৃত ব্যাঘ্রটী বাস্তবিক বাঘ নহে, প্রকৃত মনুষ্য। তাহার বয়সানুমান ৪৫ বৎসর। হাতে পায়ে বড় বড় নখ হইয়াছে, এবং লম্বিত চুল দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। বোধ হয় তাহারে অতি শৈশবাবস্থায় নেকড়ে বাঘে আনিয়া মারিয়া না ফেলিয়া স্তন্যাদি দিয়া বাৎসল্যভাবে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছে। আর সে ব্যাঘ্র সঙ্গে থাকিয়া, পশুর খাদ্য খাইয়া পশুবৎ চতুষ্পদে অর্থাৎ হাতে পায়ে হাটিয়া প্রায় প্রকৃত পশু হইয়া গিয়াছে, পশু সদৃশ শব্দও করিয়া থাকে।

সাহেব তাহাকে নিজ আবাসে আনয়ন করতঃ ক্ষৌরি করাইয়া বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। আর মনুষ্যোপযোগী উত্তম খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে দিয়া তাহারে মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া চলিতে ও কথা কহিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহার অবস্থা ও

বালকাবস্থা

আহার বিহারাদির হঠাৎ পরিবর্ত্তন হওয়ায় সে অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইল।

এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনন্ত উন্নতি লাভের নিমিত্ত সৎ শিক্ষা ও সৎসঙ্গের নিতান্তই প্রয়োজন। আর ভক্ষ্য দ্রব্যের দোষ গুণে যে স্বভাব চরিত্র সংগঠিত হয়, ইহাও এই নর পশুটী সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পশুর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া তাহার অঙ্গে পশুর ন্যায় লোম পর্য্যন্ত জন্মিয়াছিল।

বালকটী এখন এক বৎসরের হইয়াছে। সে ক্রমাগত হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া অভ্যাস দ্বারা এখন বেশ হাঁটিতে পারে। এবং মা, বাবা, দাদা, ইত্যাদি আধ আধ নানা শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে কথা কহিতেও শিখিয়াছে। আরও ক্রমশঃ বয়ঃ বৃদ্ধি সহকারে বিলক্ষণ দৌড়িতে ও লাফাইতেও শিখিল। এই দৌড় ও লম্ফ ঝম্ফ পর্য্যন্তই কি মনুষ্যের শরীর চালনার উন্নতির শেষ হইল? না। অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আসন, প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে শিখিতে হইবে। স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া উজান গতি ও বায়ু গামী হইতে

শিক্ষা করিতে হইবে। স্বরজ্ঞান বা সহজ সাধন ও ষটচক্র ভেদাদি অভ্যাস করিয়া দীর্ঘজীবী এমন কি অমর পর্য্যন্ত হইয়া জনম মরণ রূপ সংসার নরক বা উত্তাল তরঙ্গাকুল দুস্তার ভব সাগর পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মৎপ্রণীত সচিত্র শরীর গতি বা অধ্যাত্ম যোগ শাস্ত্র নামক গ্রন্থে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থরাজ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

কলিযুগে আয়ুর সংখ্যা শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ণীত আছে। হবিষ্যান্ন ভোজন এবং সদাচার করিলে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে নিত্য বৃদ্ধির পরিমাণ ধরিয়া শত বৎসরে আর বিংশতি বৎসর বৃদ্ধি হয়। মহর্ষি-গণ ইহাই নিশ্চিত পূর্ব্বক জ্যোতিষ মতে একশত বিংশতি বৎসর মনুষ্যের আয়ু নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

"নরা গজা বিশেশয়ঃ তার অর্দ্ধেক হয় বয, বাইশ বলদ, তের ছাগল; গুণে গেঁথে বরা পাগল।"

পাপ দ্বারা আয়ু ক্ষয় পায়, জীব হিতৈষী মহর্ষিগণ তাহাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সত্যযুগে মনুষ্যেরা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের আয়ু সংখ্যা লক্ষ বৎসর ছিল। তখন এক

বিংশতি হস্ত পরিমিত মনুষ্য দেহ ছিল। ত্রেতাযুগে মানবগণের কিছু পাপ স্পর্শন হয়, তাহাতে তাঁহাদের আয়ু সংখ্যা দশ সহস্র বৎসর এবং দেহের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত হয়। পরে দ্বাপর যুগে নর নিকর আরও পাপে পতিত হন, তাহাতে তাঁহাদের আয়ু-সংখ্যা সহস্র বৎসর ও সপ্ত হস্ত পরিমিত দেহের গঠন হয়। আর কলিকালে মনুষ্য সকলে বহুল পরিমাণে পাপে পতিত হওয়াতে তাঁহাদের আয়ু একশত বৎসর ও দেহের পরিমাণ সাড়ে তিন হাত হইয়া দাঁড়ায়। পাপ প্রযুক্ত মনুষ্য-গণের যেমন যুগে যুগে আয়ুর ও দেহের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তেমনি তাঁহাদের বলবীর্য্য ক্ষমতা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ঈশ্বরপ্রীতি ও ভয় ভক্তি দয়া ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস সকলি সেই পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে জল জমিয়া একটী সরোবর হইয়াছিল। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন সেই সরোবরে স্নান করিয়া-ছিলেন। দ্বাপর যুগের কোন বীরের মস্তকের খুলিতে জল থাকিলে আমাদের পক্ষেও তাহা সরোবর তুল্য হইত সন্দেহ নাই। অদ্যাপি ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে

পুত্র পৌত্রাদির মস্তক ক্ষুদ্রই হইতেছে। পিতাপেক্ষা পুত্র দীর্ঘজীবী হয় না, এই প্রণালী অবলম্বনে কলির শেষাবস্থায় পঞ্চম বৎসরের কন্যা যে পুত্রবতী হইবে মহাভারতের এ কথায় অণুমাত্র অবিশ্বাস জন্মিতেছে না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকেরা যে উক্তমত দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহার প্রমাণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও রামায়ণ মহাভারতে পাওয়া যায়। আর বাইবলেও প্রায় হাজার বৎসর মনুষ্যের জীবিত থাকার কথার উল্লেখ আছে।

পাঠক! সেই সূতিকালয়ে যে বালকটীকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছিলে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তাহার বয়স এখন পাঁচ বৎসর হইয়াছে। এই সময় হইতে তাহাকে সৎ শিক্ষা দান করা ও সৎসঙ্গে রাখা পিতামাতাদি অভিভাবকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেমন শিক্ষা, যেমন সঙ্গ ও যেমন অভ্যাস, সেই রূপই চরিত্র গঠিত হইবে। অতএব পুত্রকে পশুরূপে পরিণত না করিয়া যদি প্রকৃত মানুষ করিতে পিতা মাতার ইচ্ছা থাকে, তবে বালককে আদৌ কুসংসর্গে থাকিতে দিবেন না।

অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই, অনবরত অভ্যাসকে পারমার্থিক ভাবে লইয়া গেলে, তাহাকে সাধন বা তপস্যা

বলা যায়। একারণ সদ্বিষয়ে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর। অভ্যাস সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

পাঁচ বৎসরের বালকের পক্ষে শিক্ষা অতি সামান্য, অভ্যাসও তাদৃশ গুরুতর নহে। কিন্তু ইহাদিগের অনুকরণপ্রিয়তাই অতিশয় প্রবল এবং ক্রীড়া কৌতুকই একমাত্র লক্ষ্য। ইহারা যেমন দেখে, যেমন শুনে, প্রায় সেই মতই কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাই বলি সমাজ ও পিতা মাতাকে আদর্শ স্বরূপ হইতে হইবে। সমাজ কালিমা ও পিতা মাতাদির কুদৃষ্টান্ত যেন বালক বালিকা-দের নেত্র বা শ্রোত্র পথের পথিক হইয়া না উঠে।

বালক সুলভ স্বভাব অতি পবিত্র, নিরভিমানযুক্ত সরলতা কেমন কমনীয়। পবিত্র ভক্তি ইহাদের স্বভাব সিদ্ধ। পাপের ছায়া ইহাদের পক্ষে অভাবনীয়। তাই যীশু খ্রীষ্ট বৃদ্ধ লোকদিগকেও উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে শিশুর ন্যায় সরল না হইলে কেহই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

বালকদিগের যাহাতে ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে নিত্য ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হইবে। বিলাতি ব্যায়াম, কি না জিমনাষ্টিক; জীবন নষ্ট বলিলেও হয়,

তাহা বাঙ্গালি বালকদের উপযোগী নহে। ইহাঁরা সন্তরণ শিখিতে পারেন, সহজ জ্ঞান অর্থাৎ শারীর বিজ্ঞান বা স্বরশাস্ত্র অভ্যাস করতঃ নিষ্পন্দভাবে জলের উপরে ভাসমান হইতে পারেন। ঊর্দ্ধ হইতে তুলার ন্যায় পতিত হইতে পারেন, এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গমন করিতেও পারেন।—সচিত্র শরীর গতি বা আধ্যাত্মিক যোগশাস্ত্র নামা গ্রন্থরাজ অবলোকন কর। আসন শিক্ষায়ও শরীর বলদান এবং আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে।

ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি পূর্ব্বক ভার উত্তোলন করিলে যৌবনকালে অনায়াসে বিশমণ ভার বহন করা অসাধ্য নহে। এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে একটী বাছুরকে তুলিয়া ধরিত, নিত্য এইরূপ করিতে করিতে বাছুরটী যখন বড় হইয়া উঠিল, তখনও সে অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিতে পারিত।

পাশ্চাত্য প্রথায় বালক বালিকাদিগকে খেলা করিতে দেওয়া ভাল নহে। আর্য্যদিগের অবলম্বিত প্রাচীন রীত্যনুযায়ী ধর্ম্ম সংযুক্ত ক্রীড়া কৌতুক হিন্দু বালক বালিকা দিগের পক্ষে অতি উপযুক্ত এবং হিতকর। প্রহ্লাদ প্রভৃতি বাল্যকালে যেরূপ ক্রীড়া কৌতুকে

কালযাপন করিতেন, তদনুসরণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।—"অন্যান্য বালক নাচে ধূলা উড়াইয়া। প্রহ্লাদ নাচেরে সদা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।" যাহাতে শরীর ও আত্মার উপকার হয়, প্রাচীন ঋষিগণ আপনাদিগের যোগবলে ও তপস্যা প্রভাবে তৎসমস্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গর্ভাধান হইতে শিশুর জন্ম, কর্ম্ম, বিবাহ, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর প্রেতকৃত্য পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ কি? এস্থলে কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। জীবনে মরণে অনন্তকালের জন্যে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমরা ঈশ্বরের অধীন এবং আপন আপন কৃত কর্ম্মের অধীনে অবস্থিতি করিতেছি। আমাদের যে টুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী হয়, তবেই তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা প্রভাবেই জীব শিব হয়। নতুবা উহা ঘোরতর পরাধীনতা ও অশেষ অনিষ্টের ও দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে, এবং তাহাই নরকের পথ। "আপদা কথিতা

পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযম। তজ্জয় সম্পদা মার্গং যেনেষ্টং তেন গম্যতাং। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বা কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া চলিলে আপদের পথে পতিত হইতে হইবে। আর ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন পূর্ব্বক চলিলে সম্পদের পথে অর্থাৎ জীবনের বা স্বর্গের পথে উপনীত হইতে পারা যাইবে। এই পথকে জীবনের পথ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই পথের যাত্রীদিগকে মরিতে হয় না। তাঁহারা সকায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠিরাদি ইহার প্রমাণ। অতএব এই পথে গমন করা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান লোকের কর্ত্তব্য। কথিত আপদের পথটী অতি প্রশস্ত বিধায় সেই পথে অনায়াসে আরামের সহিত গমন করা যায় এবং স্রোতে গা ঢালিলেই হয়। কিন্তু সম্পদের পথ অতিশয় সংকীর্ণ এবং ঊর্দ্ধগামী। ঐ পথে যাইতে হইলে ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন পূর্ব্বক উজান গমন করিতে হইবে, তাহাতে বড় সুখ নাই, প্রত্যুত কষ্টের এক শেষ হয় এবং পূর্ব্ব সুকৃতিরূপ শক্তিও সকলের না থাকায় সেই দুর্লভ পদবিতে গমন করিতে সকলের সাধ্য নাই। সুতরাং এই পথের পথিক অতি অল্প।

শিশুর নির্ভরের ভাব অতুলনীয়। জগৎপাতা শিশুর নির্ভরতা দ্বারা আমাদিগকে স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া দুর্দ্দশা পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। আমাদিগের নবীন শিশুটী এখন দশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অশন বসনাদি প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ভাবনা চিন্তা নাই। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সরল বিশ্বা-সের সহিত সমস্ত বিষয় তাঁহার পিতা মাতাদি অভিভাব-কের প্রতি নির্ভর করিয়া আছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কখনই চাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে হয় না। আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল কোথায় পাইব, কে তাহা আমাকে দিবে, শিশুর মনে এ চিন্তা আদৌ স্থান পায় না। পিতা মাতা বা অভিভাবকের প্রতি শিশুর এরূপ নির্ভ-রের ভাব জগতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যাঁহারা জীবন্মুক্ত বা সংসার বিরক্ত প্রকৃত সাধু পুরুষ, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত বিষয় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। আমরা যত দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ নির্ভরের ভাব অবলম্বন করিতে না পারিব,

তত দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই আমাদের পাপ তাপ ও দুঃখ দারিদ্র এবং যন্ত্রণা ভোগের শেষ হইবে না।

ঈশ্বরের প্রতি আমরা শিশু ও সাধু পুরুষদের ন্যায় অকৃত্রিম নির্ভরতা প্রদর্শন করিতে পারি না কেন? ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস রূপ মহারোগই ইহার প্রধান কারণ। এই আত্মিক পীড়ার প্রতিকারে যত্ন করা মানব মাত্রেরই প্রকৃত মঙ্গলের বিষয়। কিন্তু বিশেষ দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য শরীরের পীড়ার প্রতিকারার্থে মনুষ্যেরা অর্থে সামর্থে যত দূর যত্ন প্রকাশ করেন, নিত্যস্থায়ী পরম দুর্লভ আত্মার পীড়ার উপশমার্থে তাহার লক্ষাংশের একাংশও যত্ন করেন না। যাহাতে দেবদুর্লভ পরম পদার্থ মানবাত্মা সকল সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া এই সংসারেই মৃত্যু জয় করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন, দিব্য পবিত্রতা ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টা করা মানব জন্মের উদ্দেশ্য। অতএব সাবধান, বরং ক্ষেপ হারিও, কিন্তু কোনক্রমে জনম হারিও না। কিন্তু মানবের কি বিচিত্র গতি, ইহারা কোটী কোটী জন্ম হারিতেছেন, তথাপি চৈতন্য প্রাপ্ত হন না! ইহার কারণ

এই যে, তাঁহাদের কর্ম্ম মন্দ। সেই কুকর্ম্মের ফলে ইঁহাদিগের নানা ইতর যোনিতে জন্ম-যাতনা-রূপ নিদারুণ নরক ভোগ হইয়া থাকে।

সুকৃতি ফলে মানবের উত্তম কুলে জন্ম ও সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে, এবং পুণ্য বশেই মনুষ্য বিদ্বান্, বলবান, ধনবান হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, গর্ভাধান সময়ে পিতা মাতার যে রূপ মনের ভাব থাকে, সন্তানও সেই ভাব বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। গর্ভাধান কালে ধৃতরাষ্ট্র জননী ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এ রূপ প্রমাণ মহাভারতাদি পুরাণে ও ইতিহাসে ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক ব্যক্তির অনেকগুলি পুত্র কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সকল গুলিই কুৎসিত, কদাকার; তাহাতে সে ব্যক্তি কোন ডাক্তারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! সুশ্রী সন্তান হইবার কোন ঔষধ আমাকে দিতে পারেন কি না? সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আপনারা স্ত্রী পুরুষে সর্ব্বদা সুন্দর মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন, এবং আপনাদের শয়ন-

মন্দিরে নিরত পদ্ম ও গোলাপাদি সুন্দর সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প আর অতি সুন্দর উৎকৃষ্ট চিত্রপট সকল রাখিয়া দিবেন, তাহা হইলে আপনার সুন্দর সন্তান উৎপন্ন হইবে। সেই ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ মত কর্ম্ম করিলে সত্য সত্যই তাঁহার সুন্দর সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব গর্ভাধান সময়ে নীচভাব, পাপ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দম্পতীর উচ্চ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সে সময় তাঁহাদিগকে পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করা আবশ্যক, এবং সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মবীর ও রূপবান্ জ্ঞানী সন্তান কামনায় ঈশ্বর সন্নিধানে সরলভাবে প্রার্থনা করা অতি উচিত।

স্ত্রীলোকদিগকেও গর্ভ ধারণাবধি দশ মাস পর্য্যন্ত অতি পবিত্রভাবে কালযাপন করিতে হইবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। তাঁহারা গর্ভের দশ মাস কাল যে ভাবে কর্ত্তন করিবেন, সন্তানও সেই ভাববিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। অতএব গর্ভিণী রমণীগণের পক্ষে গর্ভের দশমাস কাল নিয়ত উন্নতমনা হইয়া সাধুচরিত বীর-চরিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করা বিধেয়। কোন মতে কুচিন্তা, বৃথা ভাবনা, আলস্যে

কালক্ষেপণ, পাপালোপাদি করা কর্ত্তব্য নহে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে ভীতচিত্ত না হইয়া সর্ব্বদা সাহসযুক্ত থাকা প্রার্থনীয়। ইংলণ্ডদেশে এক সময়ে এক কালে অনেকগুলি নারী অন্তঃস্বত্বা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে যে গর্ভিণী পুত্র প্রসব করেন, তিনি একটী বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, অপরাপর গর্ভিণী সকল এই কথা পরস্পর শ্রবণ করিয়া কেমন এক চিন্তা যুক্তা হইয়াছিলেন, যে, সেই সকল গর্ভবতীই বিকলাঙ্গ পুত্র প্রসব করিয়াছি[illegible]

যাহা হউক শিশু ও [illegible] আমা-দেরও হওয়া উচিত। শিশুগণ পিতা [illegible] অভিভাবকগণের এবং সাধু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া যদি জীবিত থাকিতে পারেন, তবে আমরা কেন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া জীবিত থাকিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। আমাদের জানা উচিত যে, আমরা অনন্ত কালের জন্য জীবনে মরণে ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা পালয়িতা ও দাতা। তিনি যদি খাদ্যাদি সৃষ্টি না করেন, আর আমাদিগকে তাহা না দেন, তাহা হইলে আমরা কিছুই পাইতে পারি না। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন;

আকাশের পক্ষী সকলকে দেখ, তাহারা বুনেনা, কাটেনা এবং সঞ্চয়ও করে না, তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার যোগাইতেছেন। যদি অসংখ্য অসংখ্য সামান্য কীট পতঙ্গ ও পক্ষী আদি আহার পায়, তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী মানবগণ কি খাইতে পাইবে না? অবশ্যই পাইবে। খাদ্যের সংস্থান করিয়া দিয়া তবে ঈশ্বর জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ঈশ্বর গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া রাখেন, সেই দয়ালু ঈশ্বর কি আমাদিগকে আহার দিবেন না? ইহা যে আমরা কেন মনে করি, এবং পেটের দায়ে কেনইবা সংসার অন্ধকার দেখি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, "ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বাস্থ্য দান করিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন, হস্তপদ প্রদান করিয়াছেন, তোমরা কর্ম্ম করিয়া খাও, ঈশ্বর কাহাকেও খাওয়াইয়া দেন না এবং রোজগার করিয়াও দেন না।" একথা অতি অশ্রদ্ধেয়, কেননা ঈশ্বর না দিলে কেহই কিছুই পাইতে পারেন না। পুরাণ ইতিহাসের কথা এখন দূরে থাক, সে দিন অনাবৃষ্টি, জল প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে অনেকেই খাইতে পায় নাই! কেন, তাহাদের ত স্বাস্থ্য,

বুদ্ধি ও হস্ত পদাদি সকলি ছিল, তবে তাহারা অনাগারে প্রাণ ত্যাগ করিল কেন? এ দুর্ঘটনাও তাহাদের দুষ্কৃতির ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সংযোগ বিয়োগের কর্ত্তা। মনুষ্যাদি জীব বা তাহাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও হস্তপদাদি কেবল উপলক্ষ মাত্র। মরণান্তে পরলোকে গমন করিয়া আমরা কি আহার করিব? সেখানেও আমরা ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া লালিত পালিত হইব।

ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা, তিনি আমাদিগকে অশন বসনাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যোগাইয়া দিবেন বলিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা ও দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা যথাকালে ভোজন পানে পরিতৃপ্ত হয়েন। যাহারা ঈশ্বরের সেবক নহে, তাহারা সুস্থ শরীর বিশিষ্ট থাকিলে, তাহাদিগকে এ সংসারে নানাবিধ পরিশ্রমে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সে সকল লোক কর্ম্ম না করিলে আহারও প্রাপ্ত হইবে না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং অপরাধি জীবের সংসার দ্বীপে পরিশ্রম রূপ দণ্ডভোগ মাত্র।

পার্থিব রাজগণ বন্দীদিগকে আহার দেন এবং কোনস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহাদের রসদ যোগান, কর্ম্মচারি দিগকে বেতন প্রদান করেন। পিতা মাতা সন্তানদিকে প্রতিপালন করেন, আর ঈশ্বর আপন সেবক ও ভক্তগণকে প্রতিপালন করিবেন না? ইহা কি কথন সম্ভব-পর হয়। যাঁহারা উদর চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তায় পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারাই বার বার জনম হারিয়া থাকেন। যিনি কায়মনোবাক্যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকেন, তাঁহার উদরের চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি তখন সিদ্ধ পুরুষ ও সিদ্ধবাক হইয়া কতলোকের জীবিকার সংস্থান করিয়া দেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতীয় সিপাহিগণের মধ্যে অনেক ধার্ম্মিক লোক আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নারায়ণ পূজা ও গীতা ভাগবতাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন। কোন সময়ে এক দল সৈন্য হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিল। সৈন্যগণের মধ্যে কোন কোন সিপাহী সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধু দর্শন করিতে ভালবাসেন। একদা দিবাভাগে একজন সেপাহী কোন সাধুর নিকটে গমন

করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম অভিবাদন করেন। সাধু তাঁহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তাহাতে ভাগ্যবান ভক্তিমান সেপাহী যোড় হস্তে সাধু সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু নিমিলিত নেত্রে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে প্রায় এক প্রহর গত হয়, সাধু কিছুই বলেন না, সিপাহিও কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তথাপি সিপাহী ভক্তিভাবে সাধু সমীপে করপুটে দণ্ডায়মান আছেন। পরে সেই সাধু নয়ন উন্মিলন পূর্ব্বক হিন্দীভাষায় কহিলেন, "সিপাহীজী! আপ্‌কা পাস্ কুছ্ রূপেয়া হ্যায়?" সিপাহির কটিদেশে একটী গাঁজিয়ার মধ্যে ত্রিশটী টাকা ছিল। সেপাহী মনে করিলেন, বুঝি সন্ন্যাসীর টাকার দরকার আছে। আমি যদি বলি যে আমার নিকট ত্রিশটাকা আছে, তাহা হইলে তিনি হয় তো সেই সকল টাকা-গুলিই চাহিয়া লইবেন। এই ভাবিয়া সিপাহী বলিলেন, "মেরা পাস্ তিন রূপেয়া হ্যায়।" তাহাতে সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তিনকে তিন বনি রহে, তোম চলা যাও।" সাধু আজ্ঞা লংঘন করা পাপ কার্য্য জানিয়া সিপাহী আর কিছুই না বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আবা-

সাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সিপাহি আপন কোমর হইতে গাঁজিয়া খুলিয়া দেখেন যে, গাঁজিয়ার ভিতর কেবল তিনটী টাকা আছে, বক্রী সাতাইশ টাকা নাই। তাহাতে সিপাহী আপন শিরে করাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ রাস্তার মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, সন্ন্যাসী স্বীয় তপোবলে অলক্ষিত ভাবে আমার সাতাইশটী টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার সাধু-বাবার সন্নিধানে গমন করিয়া কাকুতি মিনতি করিলে তিনি কতক টাকা প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। এই মনে করিয়া সিপাহি পুনরায় সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা! আমি অনেক বৎসর ধরিয়া ত্রিশটীমাত্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছি, আমার আর কোন সম্বল নাই, আমি দুঃখী! আপনি কৃপাপূর্ব্বক তিনটী টাকা গ্রহণ করত আমাকে চব্বিশ মুদ্রা ফিরিয়া দিন, যেহেতু আপনাকে তিনটাকা প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার কাছে কত টাকা আছে, তখন আমি ত্রিশটাকা সত্ত্বে তিনটাকা আছে বলিয়াছিলাম। সিপাহির বিশেষ কাকুতি মিনতি এবং এই

সকল বচন শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে সিপাহিকে বলিলেন, আমি তোমার একটিও টাকা গ্রহণ করি নাই। ভগবানের মরজি মতে তোমার ত্রিশ টাকার স্থলে তিন টাকা হইয়াছে। যাও, ঈশ্বর ইচ্ছা এবং আমার কথা অন্যথা হইবার নহে। তোমার এই তিন টাকা অক্ষয় অব্যয় হইবে। তুমি যত ব্যয় কর না কেন, তোমার ঐ তিন টাকা সর্ব্বদাই মজুদ থাকিবে। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসীর বরপ্রভাবে সেই সিপাহী উক্ত তিন টাকা অবলম্বন করিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠক! দেখুন, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার সেবা ও আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে উদরের চিন্তা করা দূরে থাক, যমের চিন্তা করিতেও হয় না। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কেবল বাক্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের ভরণ পোষণ করিতে পারেন।

বিদ্যা শিক্ষা কালে বালককে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, কিসে কি হয়, তৎ সমস্ত জানিতে হয়। কেবল বাল্যকাল যে বিদ্যা শিক্ষার সময় তাহা নয়, মনুষ্যের চির জীবন এমন কি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা করিলেও পূর্ণ শিক্ষা লাভ হয় না। তবে যিনি যে পরিমাণে

শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সেই পরিমাণেই জ্ঞানী মানী হইয়া থাকেন। মনুষ্য জীবনে বাল্যকালে সাংসারিক কোন চিন্তা থাকেনা বলিয়া বাল্যকালই শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সময়। এ অমূল্য সময় বিফলে বহিয়া গেলে আর ভাল শিক্ষা হয় না। শিক্ষিত লোকের সহিত অশিক্ষিত লোকের তুলনা করিলে আকাশ পাতালের ন্যায়, পৌর্ণমাসী-রজনী ও অমানিশার ন্যায় প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। শিক্ষিত লোক রাজ প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের মন্ত্রী সভার অন্যতম মন্ত্রির পদে বরিত হয়েন, আর অশিক্ষিত ব্যক্তি রাস্তার নরদমার ময়লা পরিষ্কার করে। আলস্য বিহীন হইয়া পরিশ্রম করিলে বিদ্যাদি উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু কেহ কেহ অলস পরবশ হইয়া বিদ্যালাভ করিতে না পারিয়া আজীবন মূর্খ হইয়া থাকে। কেহ ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিয়া মহা সুখে কালাতিপাত করতঃ মরণান্তে চন্দন কাষ্ঠে সৎকার প্রাপ্ত হয়েন, আর কেহবা অপুত্রক নিরাশ্রয় ভিক্ষোপজীবী হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়া গো-ভাগাড়ে পড়িয়া মরে, শৃগাল কুকুর শকুনি প্রভৃতি তাহার মৃত দেহ ভক্ষণ করে। কেহ কাঁধে চড়ে,

কেহ কাঁধে করে। কেহ বা পরমসুন্দর ও পুণ্যবান, আর কেহ কেহ কুরূপ, পাষণ্ড। এক জন যাবজ্জীবন সুস্থ শরীরে মনের সুখে কাল যাপন করে, আর অপরে গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া পচিয়া মরে! ইহার কারণ পূর্ব্ব জন্মের ও ইহ জন্মের কর্ম্ম ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাপিদের পাপ রোগের উপশম ও চরিত্রগত দোষ সংশোধন এবং শিক্ষা দান করণাভিপ্রায়ে পরম দয়াল মঙ্গলময় মহেশ্বর ঐ সকল শাস্তি জনক শাস্তির বিধান করিয়াছেন। যেমন রোগ তেমনি চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এক ব্যক্তির হস্তে সর্পে দংশন করিয়াছে। সর্প দষ্ট ব্যক্তির জীবন নাশের সম্ভাবনা। সেস্থলে তদ্দণ্ডে তাহার হস্ত কাটিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। এখানে হস্ত কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করা মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। তেমনি পরম কারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বর জীবের পাপ বুঝিয়া শাস্তি রূপ চিকিৎসা করেন। যে পাপে পাপীর অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে,সেই পাপের পাপিকে যদি পরমেশ্বর গলিত কুষ্ঠ রোগে সংহার করেন, তবে কি তাঁহার পরম দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না? ঈশ্বর নির্গুণ ও নির্লিপ্ত,

তিনি কাহারও দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করেন না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

ঈশ্বরাভিপ্রেত নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে, জীবের মঙ্গল ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। ঈশ্বরের নিয়মমত জীব সকল স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার কারণ এ জগতে জন্ম গ্রহণ করে। জীব মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, তাহারা মনে করে, যে, আমরা সকলে স্বাধীন এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছি। ইচ্ছা হইল, ঈশ্বর আছেন বলিয়া তাঁহাকে মানিলাম, তাঁহার সেবা উপাসনা করিলাম। ইচ্ছা না হইল, ঈশ্বর নাই বলিয়া নাস্তিক হইলাম, আর যথেচ্ছা-চারে আহার বিহার করিলাম। ইহা তাহাদের নিতান্ত ভুল! আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের নিয়মের অধীন। সেই নিয়ম ছাড়া আমরা এক পা চলিতে অথবা সেই নিয়ম ছাড়িয়া কিছু বলিতে বা করিতে পারি না। আমাদের প্রতি সুখ দুঃখাদি যখন যাহা ঘটে, তাহা সেই নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ আমাদিগকে স্বাধীন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম। মোহ

বশতঃ আমাদের ঐ রূপ অনুভব হইতেছে। আমরা যদি স্বাধীন, আমরা যদি নাস্তিক, তবে ইচ্ছা মত রাজা হই না কেন? ইচ্ছা মত পীড়ার বা দুঃখের এবং মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হইতে পারি না কেন? এক মুহূর্ত্তের পরে কি ঘটিবে, তাহা যখন আমরা জানিতে পারি না, তখন আমরা স্বাধীন না নাস্তিক!! কাল-মাহাত্ম্যে আজ-কাল নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক। তাই জগতের লোকের এত দুরবস্থা। এ কথা প্রসঙ্গত অন্য স্থানে বর্ণিত হই-য়াছে। সকল মনুষ্যই যে [illegible]রের নিয়মাধীন, তাহা নহে, যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারাই সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুক্ত পুরুষের প্রসঙ্গে কোন কোন কথা পরিশিষ্টে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে এই, আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের নিয়মের অধীন, এবং তাঁহারই অধীনে তাঁহারই অভিপ্রায় ও নির্দ্দিষ্ট মতে কর্ম্ম করিতেছি, তবে আমরা যে যে কর্ম্ম করিতেছি, তৎসমস্তই যেন নিজের কাজ করিতেছি বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে কেন? ইহার উত্তর—আমাদের অজ্ঞান মূঢ়তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

জীব সকল পরস্পর পরস্পরের সেবা করিতে জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পাপ প্রযুক্ত জীব যে জগতে জন্মে ও মৃত্যু গ্রস্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজা প্রজা পালন করিতেছেন, প্রজা রাজ সেবা করিতেছে। পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রতিপালন করিতেছেন, পুত্র কন্যা পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। মনুষ্য সকলের জন্য কৃষকেরা ধান্যাদি প্রস্তুত ও তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে। বৈদ্য পীড়িত ব্যক্তিদের রোগ শান্তির নিমিত্ত ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছেন। এই প্রকারে বহু লোকে কেবল মনুষ্যাদি জীব পুঞ্জের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ করিতেছে। কর্ম্মচারি বা ভৃত্যের বেতন দিতে সকলেই বাধ্য। এবং কর্ম্মচারি ও ভৃত্যগণও অবশ্যই বেতন পাইবার যোগ্য। ক্রীত-কিঙ্করেরাও আপন আপন প্রভুর নিকট হইতে অন্ন বস্ত্র পাইয়া থাকে। এই অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে মনুষ্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারি সকলেও স্বস্ব পরিশ্রমানুযায়ী কেহ কেহ বেতন ও কেহ কেহ বা কেবল অন্ন বস্ত্র পাইয়া থাকে। আর যাহারা মনুষ্যের সেবা উপযোগী ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট মত কোন কার্য্যে নিযুক্ত নহে, তাহারাই অন্ন বস্ত্রের জন্য দুঃখ

ভোগ করিয়া থাকে, এবং অনেকে নিরাশ্রয়ে নিরাহারে প্রাণত্যাগ করে। কর্ম্মফলে বহুলোক বিকলাঙ্গ অন্ধ,খঞ্জ ও গলিত কুষ্ঠরোগী আদি হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা কোন কর্ম্ম করিতে পারেনা। তাহাদিগকে প্রতিপালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কৃপায় তাহারা কেহই অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হয় না। তাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, অন্ধ, খঞ্জ ও গলিত কুষ্ঠ রোগী প্রভৃতি অক্ষম দুঃখী লোক সকল অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ সকল দুর্দ্দশায় আনয়ন করত শাস্তি প্রদান করিতেছেন। ঈশ্বর যাহাদের প্রতি বিমুখ, তাহাদের প্রতি দয়া করা মানবের কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের ক্রোধের ভাজন হইতে হইবে। এ বাক্য অশ্রাব্য এবং অতিশয় অশ্রদ্ধেয়। দয়া ধর্ম্ম হীন মনুষ্যেরাই কেবল এ কথা বলিতে পারেন। ঈশ্বর না করুন, তাঁহাদের যদি ঐ রূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? তখন কি তাঁহারা পরের দয়ার প্রতি নির্ভর করিবেন না?

আমার পরিচিত কোন ব্যক্তি বলেন, যে, সুখ

দুঃখ কাহারও চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্বাস্থ্য কাহা-রও চিরকাল সমান থাকে না। ঈশ্বর না করুন, আমার যদি কর্ম্ম মন্দ থাকে, আর আমি যদি বৃদ্ধ বা বিকলাঙ্গাদি হেতু নিরাশ্রয়, নিঃস্ব ও পথের ভিখারী হই, তাহা হইলে, দয়া ধর্ম্ম বিহীন মূঢ় লোকদের মুখা-পেক্ষী না হইয়া আমি ত্রিতাপ নাশিনী গঙ্গা বাসী হইয়া প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করত, তাঁহারই নিকট হত্যা দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

কোন কোন লোক [illegible]লে ভূত হয়। ভূতের কথা পরে বলিব। কিন্তু যাহারা হত্যা দিয়া মরে, তাহারা এক স্বতন্ত্র লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শতবর্ষ গত হইল, রতন পাঁড়ে নামক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হিন্দুস্থানী এক ব্রাহ্মণ যুবক প্রয়াগে বাস করিতেন। সেই সময় তথায় এক জন ক্ষত্রিয় জমীদারের বাটীতে ভাগবত পুরাণ পাঠ হইতেছিল। পুরাণ পাঠক পণ্ডিত পাঠ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা ভুল করিতেন এবং দুই এক স্থান অশুদ্ধ পাঠ করিয়া যাইতেন। সেইখানে এক নিম্ব বৃক্ষ মূলে পুরাণ পঠিত হইত এবং শ্রোতৃবর্গ তাহার চতু-ষ্পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিত। যখন ভাগ-

বত পাঠ হইত,তখন এক বন্য শুক পক্ষী আসিয়া ঐ বৃক্ষে উপবিষ্ট হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। পক্ষীটী জাতিস্মর ছিল। জাতিস্মর শুক পক্ষীর কথা ভারতবর্ষে নূতন নহে। বৃন্দাবনের শারী শুক, রাজা বিক্রমাদিত্যের শুক পক্ষী এবং কাদম্বরীর জাতিস্মর শুক সুবিখ্যাত।

যাহা হউক আমাদের এই নিম গাছের জাতিস্মর শুকের কথা বলাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। পুরাণ পাঠক পণ্ডিত মহাশয় যখন শুদ্ধরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া যান, তখন ঐ শুক পক্ষীটী মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করে। আর পণ্ডিত মহাশয় যখন কোন ভুল বা অশুদ্ধ বলিতেন, তখনি ঐ বিহগ শ্রেষ্ঠ আপন উৎকৃষ্ট মিষ্ট ও নম্র স্বরে বলিয়া উঠিত, "পণ্ডিতজি! এ বচনটী এই রূপ হইবে।" শুকের মুখে অভাবনীয়রূপে এমত বিশুদ্ধ ও চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাসুদ্ধ শ্রোতৃ সমূহ, পণ্ডিত এবং ঐ জমীদার মহাশয় বিস্ময়রসে অভিভূত হইলেন। অনন্তর পণ্ডিত এবং সেই জমীদার কহিলেন, হে শুক! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এই সভা মধ্যে বসিয়া ভাগবত শ্রবণ কর, আমরা অতি আদর ও মান পূর্ব্বক তোমাকে আসন প্রদান করিব।

তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, তোমার প্রতি আমরা কোন অত্যাচার বা তোমার স্বাধীনতা সংহার করিয়া তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিব না। শুক এ কথায় সম্মত না হইয়া, সেই নিম্ব বৃক্ষেই উপবেশন পূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করিত। এইরূপে এক পক্ষ কাল গত হয়, শুক নিয়মিত মতে আগমন ও নিত্য পুরাণ শ্রবণ করে, জমীদারও প্রত্যহ শুককে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিতেন, কিন্তু সে কোন ক্রমেই নিম্নে অবতরণ করিতে সম্মত নহে।

শুক নিত্য আসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করে, আর পণ্ডিতের কোন ভুল হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। এক দিন শুকের কেমন কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল, পণ্ডিতজী এবং জমীদার মহাশয় তাহারে অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, পক্ষিরাজ! তুমি সভায় আসিয়া উপবিষ্ট হও, আমরা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি তোমার কোন ভয় নাই। তাহাতে শুক কহিল আমি রতন পাঁড়ের দোহাই দিয়া বলিতেছি, "আপনারা যদি তাঁহার নামে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, রতন পাঁড়ের দোহাই, আমরা তোমার প্রতি কোন অত্যাচার কি

তোমারে বন্দী করিব না। তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে আপনাদের নিকটে উপবেশন করিয়া ভাগবত শ্রবণ করিতে পারি। শুকের এই বাক্য শুনিয়া জমীদার ও পণ্ডিত বলিলেন, আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং রতন পাঁড়ের দোহাই দিয়া বলিতেছি, তুমি নামিয়া আইস, আমরা তোমার প্রতি কোন অত্যাচার বা তোমারে বন্দী করিয়া রাখিব না, তুমি যেমন নিত্য পুরাণ শ্রবণার্থে গমনাগমন করিতেছ, তেমনি নির্ব্বিঘ্নে নিত্য যাতায়াত করিতে পারিবে। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ও রতন পাড়ের দোহাই দিয়া পক্ষিবর নিম্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সভায় আসিয়া ভক্তি ভরে প্রণাম করত পণ্ডিতজীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

শুক পক্ষীটী যেমন সভায় আসিয়া বসিল, অমনি জমীদার বাবু তাহাকে ধরিয়া পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পক্ষী বন্দী হইয়া পিঞ্জর মধ্যে ছটফট করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। সেই দিন রাত্রে রতন পাঁড়ের বিবাহ হইবে। রতন এই শুক পক্ষী সম্বন্ধীয় বার্ত্তা কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। শুক প্রাণত্যাগ করিলে পর, লোক পরম্পরা তিনি এ কথা অবগত হইলেন। তিনি

যে সময়ে বিবাহ করিতে গমন করিতেছেন, সেই সময়ে শুকের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাহাতে তিনি বিবাহার্থ গমনে ক্ষান্ত হইয়া, হস্তে সূত্র বন্ধনাবস্থায় বরবেশে জমীদার বাবুর আবাসে আগমন করিলেন এবং জমীদারকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার সে শুক পক্ষীটী আনিয়া দাও। তাহাতে জমীদার পিঞ্জর বদ্ধ মৃত শুক আনিয়া রতন পাঁড়েকে দেন। রতন তাহা গ্রহণ না করিয়া, জমীদারকে কহিলেন, তুমি যেমন জীবিতাবস্থায় পক্ষীরত্ন ধৃত করিয়াছিলে, আমি সেই রূপ এই মৃত শুককে জীবিতাবস্থায় এই দণ্ডেই তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। রতন পাঁড়ের তেজপুঞ্জ কলেবর ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকনে এবং আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে, জমীদার ভীতচিত্ত ও অবাক হইয়া রহিলেন। জমীদার কোন ক্রমেই সেই মৃত শুককে জীবিত প্রদান করিতে পারেন না, রতন পাঁড়েও তাঁহার বাড়ী ছাড়েন না। অবশেষে জমীদার বাবু আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া, তাহা হইতে ক্ষমা পাইবার প্রার্থনায়, রতনের পায়ে পড়িয়া অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে তিনি

প্রসন্ন না হইয়া, জমীদারের বাটীতে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

এই রূপে ২।৩ দিন যায়, ক্ষত্রিয় জমীদারের বাটীতে ব্রাহ্মণ যুবক অনাহারী, তাঁহাকে ভোজন না করাইয়া জমীদার কিরূপে সপরিবারে আহার করিতে পারেন? আর অনাহারেই বা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করেন! জমীদার মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া, সপরিবারে সে স্থান পরিত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করিলেন। রতনও তথায় উপস্থিত হইয়া হত্যা দিয়া রহিলেন। তিন দিন উপবাসের পর জমীদার আহার করিলেন, কিন্তু রতন হত্যা দিয়াই রহিলেন। একুশ দিনের পর তাঁহার কঠোর অনশন রূপ হত্যা ব্রতের উদযাপন হইল। তাঁহার পবিত্র আত্মা মায়াময় শোক তাপ পরিভোগী দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্ত পুরুষ হইয়া উঠিলেন।

রতনের প্রাণত্যাগের পরদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সেই জমীদারের পুত্র কন্যাদি পরিবার সকল ও অবশেষে জমীদার স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বংশে বাতি দিতে কেহই রহিল না। ভিটেয় ঘুঘু চরিতে লাগিল।

নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ স্বার্থহীন কার্য্যের কথা বলিতে বলিতে আমরা প্রসঙ্গতঃ আর আর অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিতে করিতে এতদূরে আসিয়া পড়িলাম। পাঠক মহাশয় গণ একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাঁহারই নিযুক্ত মতে আমরা তাঁহারই কার্য্য করিতেছি, আমাদের নিজের কার্য্য কিছুই নহে, এইটী ধারণা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যথা —

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি„

বালকগণকে প্রথম হইতেই সদভ্যাস ও পরিমিতাচারী এবং সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে বাল্যকাল হইতে সেই রূপেই শিক্ষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সকলে সে শিক্ষা ধারণা করিতে পারে না এবং অভিলষিত বিষয়ে শিক্ষিতও হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, যেমন কঞ্চিকে যে দিকে ইচ্ছা নত করা যায়, বালকদিগকেও বাল্যকাল হইতে সৎ শিক্ষা দান করিলে, তাহারাও সৎ ও সুশিক্ষিত হয়, কিন্তু সে সংস্কার ভ্রমাত্মক।

পৌগণ্ডাবস্থা

পূর্ব্ব সুকৃতি অনুযায়ী যে লোকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান, জ্ঞানী, ধনী, মানী ও সাধু হইয়া থাকে, পূর্ব্ব সুকৃতি অনুসারে মনুষ্য সকল যে সৎকুলে জন্ম লাভ করে, পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে কেহ কেহ যে মহা মহা বলবান বীর পুরুষ হইয়া জন্মে, আমাদিগের আর্য্য ঋষিগণের এ সিদ্ধান্ত কে খণ্ডন করিতে পারে? চারুপাঠে মেগ্লিয়া বেথির আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির বিষয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির কথা কে না শুনিয়াছেন? ত্রিবেণী নিবাসী জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের স্মরণ শক্তিও অতুলনীয় ছিল। এ সকল কেবল পূর্ব্ব সুকৃতির ফল, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতি দীন দুঃখী মহা মূর্খের পুত্র সুপণ্ডিত হইয়াছেন, আর অতি ধনী মহা বিদ্বানের পুত্র নানা সুযোগ সত্ত্বেও নিতান্ত মূর্খ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ নিতান্ত দরিদ্র দশায় থাকিয়াও ধনকুবের হইয়াছেন এবং কোন কোন মহা ধনী ব্যক্তিও বাণিজ্য করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দীন হীন কাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র রহিয়াছে। মূল কথা এই কর্ম্মফল সকল-

কেই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্ম যদি মন্দ থাকে, তবে মহা বিদ্বান ও অতি ধনবান এমন কি রাজার সন্তান-কেও শত শত শিক্ষক রাখিয়া শিক্ষা দান করিলে কখ-নই তাহার মূর্খত্ব ঘুচিবেনা। সে অবশ্যই তাহার কর্ম্ম ফলে মেধা হীন ও অলস এবং বিলাসী হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিবে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না।

আমি একটী বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্দ্বারা বালক-চরিত্র এবং মানবের পূর্ব্ব সুকৃতির বিষয় আমি বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি। এই বাল-কটীকে শত সহস্র অমূল্য হিতোপদেশ ও বিবিধ সদ্দৃ-ষ্টান্ত দিয়া কোনমতেই ইহাকে সৎপথের পথিক করিতে পারিলাম না। অলসের দুঃখের অন্ত নাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহারে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে আলস্যের দাসত্ব করিতে ত্রুটী করে না। সহস্র সদুপদেশ অবহেলা করিয়া সে দুষ্ট বালকদের কুস্বভাব গুলিই অভ্যাস করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই, কোন বালকের সৎস্বভাবের অনুকরণ করিতে সে আদৌ সক্ষম নহে। পূর্ব্ব জন্মের বা ইহ জন্মের কর্ম্মানুসারে অজ্ঞান

কৈশোরাবস্থা.

বশতঃ যাহার যে স্বভাব হইয়া থাকে, সে স্বভাব ত্যাগ করা তাহার সাধ্যায়ত্ব নহে। তবে যদি কোন রূপে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এখন কু অভ্যাস অর্থাৎ আলস্য ও কু সঙ্গাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতো-ভাবে সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গ লাভে যত্নবান হইয়া সৎপথের পথিক হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে জ্ঞান লাভও সুকৃতি সাধ্য। শিক্ষা ও নানা সৎ ও অসদ্দৃষ্টান্ত সত্ত্বে লোকে যে সৎ না হইয়া কেন অসৎ লোক হইতে ভাল বাসে, ইহা কি তাহাদের কর্ম্ম ফল নহে?

যাহা হউক, সেই শিশুটী এখন পৌগণ্ডাবস্থা অতি-ক্রম করিয়া কৈশোরাবস্থায় উপনীত হইলেন, এখন হইতে ইহাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে চলিল। এই সময় অবধি সৎশিক্ষা, সৎ সঙ্গ ও সদভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক। যাহাতে দেহ ও মন বা আত্মা যাবজ্জীবন পবিত্র ও সুস্থ থাকিতে পারে, এখন হইতেই সেই চেষ্টা বা তদুপযোগী কার্য্য সকল অভ্যাস করিতে হইবে। কৈশোর কাল হইতেই পরিণীতা পত্নী ভিন্ন অন্য মহিলা মাত্রকেই মাতৃ জ্ঞান করিতে হইবে, নতুবা মন কাম কলুষিত হইয়া পরিণামে মুখুর্য্যা মহাশয়ের ন্যায় দুর্গতি

প্রাপ্ত হইবে। মুখুর্য্যা মহাশয়ের কথা স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। এখন প্রাতঃ স্নান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। নিশাব-সানে ভগবন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ মল মূত্র পরিত্যাগ ও নিম্ব কাষ্ঠে দন্তধাবন পুরসর প্রাতঃ স্নান করিবে। স্নানানন্তর শুষ্ক ও পবিত্র বস্ত্র পরিধানান্তে পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিয়া, সচন্দন ইষ্ট দেবতার পূজা করা উচিত। আর নিয়ম মত নিরামিষ হবিষ্যান্ন অর্থাৎ ভগবৎ প্রসাদ ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেহ ও আত্মা উভয়ই প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে। তামাকু, অহিফেণ, গাঁজা কি মদ্য পানাদি কোন নেশাই করিবে না এবং কখন কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না, উচ্ছিষ্ট আহার করিলে, সুকৃতি ক্ষয় এবং যাহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে, তাহার যে সকল রোগ থাকে, তাহা ভোগ করিতে হয়। যাহারা তামাকু খাইয়া থাকে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। তামাক, বিলাতী লবণ ও মদ, এই তিনটী কলির প্রধান সহায়। কেননা এতদ্দ্বারা অনায়াসে ম্লেচ্ছাচার ও একাকার সাধিত হয়। তামাকু খাইলেই হস্ত দ্বয় অশুচি হয় দোকানদারেরা প্রায় সকলেই তামাকু সেবনান্তে হস্ত

প্রক্ষালন না করিয়া, সেই অশুচি হস্তেই ঘৃত, দুগ্ধ, সন্দেশাদি নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী দেবতার ভোগে লাগে না, এবং যাহারা তাহা আহার করে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, তামাকু বিষে নানা পীড়া জন্মিয়া থাকে। অতএব তামাকু পরিত্যাগ করা সর্ব্ব সাধারণেরই উচিত। বিলাতী লবণে মনুষ্য ও গবাদির অস্থির ফুট দেওয়া হয় এবং নানা ইতর জাতির অন্ন দ্বারা মদ্য প্রস্তুত হয়, সুতরাং বিলাতী লবণ ও মদ্য সেবনে জাতি ধর্ম্ম সকলি নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতাদি সহরে ময়রার দোকানে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সহিত সলবণ ব্যঞ্জন বিক্রয় হইয়া থাকে। এবং মেথর ও মুসলমানাদি লোকেও ঐ সকল দোকান স্পর্শ করিয়া থাকে। অতএব উক্ত দোকান সকল হইতে লুচি, কচুরী, সন্দেশাদি ক্রয় করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের কোন সংস্রব নাই, তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। খাদ্য দ্রব্য পবিত্র না হইলে, কখনই মন পবিত্র হয় না। মন পবিত্র না থাকিলে, ধর্ম্মে মতি হয় না। এ জন্য আর্য্য

ঋষিগণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি সাধু ভিন্ন অন্য কোন ইতর জাতির অন্ন ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বার বৎসর যে জাতীয় লোকের চাকরী করিয়া তাঁহার অর্থে প্রতিপালিত হওয়া যায়, চাকরী জীবি লোককে সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। রূপ সনাতন গোস্বামী যবনের অর্থে প্রতিপালিত বলিয়া আপনাদিগকে যবনের ন্যায় নীচ মনে করিতেন। একবার এক বেশ্যার ধনে কোন দেবতার ভোগ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রসাদ পাইয়া কোন কোন বাবাজির চিত্ত কলুষিত হইয়া যায়। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন ও দ্রব্যাদি ভোজন করা কর্ত্তব্য।

কৈশোর কালের পর যৌবন কাল উপস্থিত হয়। এই সময় মনুষ্য জীবনের বসন্ত কাল অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট সময়। গ্রন্থকারের ভাগ্যে এ ই সুখময় উৎকৃষ্ট সময় টুকু একবার উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি তখন তাহার উত্তমতা বুঝিতে না পারিয়া সেই সাধের যৌবনের মর্য্যাদা রক্ষা না করাতে যৌবন কালটী যেন শীঘ্র চলিয়া গিয়াছে। এখন তিনি তন্নিমিত্ত বিশেষ অনুতাপ করিয়া থাকেন। আমার প্রিয় যুবক! তোমার

যৌবনাবস্থা

এখন সেই সাধের যৌবন কাল এবং জীবনের অতি উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় এ সুযোগ যদি তুমি অবহেলা করিয়া কাটাও, তাহা হইলে তোমার আর দুরদৃষ্টের সীমা থাকিবে না। এ সময় তোমাকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হইবে। কখনও এমন কি ভ্রম ক্রমেও আত্মবশে চলিও না। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ ও প্রাচীন জ্ঞানিদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যদি কখনও সমবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাদের পরামর্শমতে কুপথে চলিও না। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের আজ্ঞা পালনে ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার মর্য্যাদা রক্ষণে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা, এ জগতে তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় সর্ব্বদাই সন্দর্শন করিতেছি। পিতা মাতার অমর্য্যাদা করিয়া, তাঁহাদিগকে লংঘন করিয়া কি তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করিয়া যে মূঢ় অন্যত্রে ঈশ্বরের দর্শনাকাঙ্খী হয়, তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। যিনি অপ্রাকৃত ভক্তি ও পবিত্রতার সহিত সেই পুরুষ প্রকৃতি সাক্ষাৎ

ঈশ্বর পিতা মাতার পূজা করেন, তাঁহাদের চরণামৃত ধারণ ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তাঁহারে আর কোন্ ধর্ম্মই করিতে হয় না, তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত ও জগৎ পূজ্য মনুষ্য আর নাই। পিতৃ মাতৃ হীন দুর্ভাগ্য জীবের জন্ম না হওয়াই ভাল।

পিতা মাতাকে প্রহার করিয়া অনেক লোকের কুষ্ঠ রোগ হইয়াছে। এক ব্যক্তি জননীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিয়াছিল। ছয় মাসের মধ্যেই তাহার কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার পর সে ব্যক্তি কোন শিষ্ট লোকের উপদেশ মতে নিয়মিত রূপে মাতার চরণামৃত পান, সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার পদধূলি লেপন ও মাতার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার সেই মহাব্যাধি আরোগ্য হইয়া যায়।

এক জন আপন পিতাকে প্রহার করিয়াছিল। তিন চারি বৎসরের পর তাহার এক প্রকার পীড়া জন্মিলে, যে হস্তে সে পিতাকে প্রহার করিয়াছিল, তাহার সেই হস্তখানি খসিয়া পড়ে। এবং আর কিছু দিন পরেই সে প্রাণত্যাগ করে।

আমরা জানি, আর দুই জন পাষণ্ড আপন আপন

জননীকে জুতার দ্বারা প্রহার করিয়াছে, ৫।৬ বৎসর গত হইল, এ পর্য্যন্ত তাহারা সুস্থ শরীরে আছে।

কোন কোন আধুনিক বাবু পাশ্চাত্য সামান্য বিদ্যা-মদে এবং যৎ সামান্য চাকরী গরবে আপন আপন হীন পরিচ্ছদধারী অকৃতবিদ্য পিতাকে চাকর বলিয়া বান্ধব সমাজে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। আরও শুনিয়াছি, ঐ দল ভুক্ত কোন কোন বাবু মাতৃ ঋণ পরিশোধের প্রয়াসী হইয়া, মাতৃ পূজার পরিবর্ত্তে গুদাম ভাড়া দিতে চাহেন। ইহাদিগের পাপভার বসুমতী আর কত দিন সহ্য করিবেন?

যুবক! এই বয়সে তোমার দুটী কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটী শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা, অপরটী আত্মোন্নতি। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে প্রাতঃ স্নান, স্বস্তিক ও পদ্মাসনাদি আসন রূপ ব্যায়াম ও হবিষ্যান্নাদি পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। আর আত্মোন্নতি সম্বন্ধে সাধু সঙ্গ, ভাগবতাদি সৎগ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে কি শারীরিক, কি সামাজিক, কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না হইয়া প্রত্যুতঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে হয়, এমন কুৎসিত

নাটক, নবেল ও উপন্যাসাদি বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সকল কুগ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ করিয়া এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত না করিয়া নিত্যনিত্য নিরলস হইয়া নিয়মিত রূপে ভাল ভাল গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে থাক। যত অধিক অধ্যয়ন করিবে এবং অধ্যয়নের ফল স্বরূপ সেই সেই গ্রন্থোক্ত সদুপদেশমত চলিবে, ততই তুমি বিদ্বান, জ্ঞানবান ও সাধু হইতে পারিবে।

এ সংসারে যেমন অর্থ না হইলে দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না, পরলোকে ধর্ম্ম ধন না থাকিলে, অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, সৎপথে থাকিয়া, ধন উপার্জ্জন কর। সৎপথে থাকিলেই ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে, ধর্ম্ম লাভ হইলেই জন্ম সার্থক হয়। সংসারে নিজের ও পরিজনবর্গের ভরণ পোষণার্থে অর্থ নিতান্তই প্রয়োজন বটে, তজ্জন্য কোন সদ্ব্যসায় বা সৎ পরিশ্রমে ধনার্জ্জন করিতে হইবে। অর্থ লাভার্থে স্বহস্তে হল চালনা কর, মুটে গিরি কর, তাহাতে লজ্জা নাই, অধর্ম্মও নাই, পরিশ্রম করিতে নিতান্ত অপারক হইলে ভিক্ষা করিয়া খাও। ভিক্ষা না পাইলে বরং অনাহারে প্রাণ ত্যাগ কর, সেও ভাল;

তথাপি অন্যায় রূপে অসৎ উপায়ে, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, জুয়াচুরি কি প্রতারণা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিও না।

সদা সত্য কহিবে, সত্য পথে থাকিবে। সত্যে বিচলিত হইলে, তোমার এহকাল নাই, পরকালও নাই।

কখনও কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না, এবং কাহারও নিকট এক পয়সাও ঋণী হইও না। পর দ্রব্য গ্রহণ ও ঋণের মহদ্দোষ এই যে, একবার যদি কাহারও কোন জিনিস লইয়া প্রত্যর্পণ না কর এবং কাহারও নিকট ঋণগ্রস্ত হও, তবে তোমাকে চিরকালই পর দ্রব্য গ্রহণ করিতে ও পরের নিকট ঋণী হইয়া থাকিতে হইবেই হইবে, ইহা পরীক্ষিত বাক্য।

যেমন শুভ কর্ম্ম শীঘ্র না করিলে, সে কার্য্য সম্পাদনে আর সুযোগ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি তুমি তোমার কোন বস্তু বিক্রয় করিব বলিলে, লক্ষ চেষ্টায় আর তুমি সে বস্তুকে গৃহে স্থির রাখিতে পারিবে না, তাহা যে প্রকারে হয়, তোমাকে বিক্রয় করিতে হইবেই হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহাও পরীক্ষিত বাক্য।

পাঠক! তুমি যৌবন কালে অর্থ সঞ্চয় করিতে আরম্ভ কর, বার্দ্ধক্য সময়ে সুখে থাকিতে পারিবে। এ মহা বাক্য অবহেলা করিলে, তোমার অদৃষ্টের দারুণ দুঃখ আর কেহই ঘুচাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও, চিরকাল কাহারও কখনই সমান যায় না। অতএব তোমরা সুসময়ে কখনই অপব্যয় করিও না। সে সময় মহা কৃপণের ন্যায় কেবল ধন সঞ্চয় করিতে থাকিও। যখন দেখিবে যে, তোমার এত সম্পত্তি হইয়াছে যে, তাহার উপস্বত্ব বা সুদে তোমার অক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আরো কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তখন সেই উদ্বৃত্ত ধনে তুমি দীন দুঃখীর উপকার করিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রিক্তহস্ত থাকে, অর্থাৎ যাহার কাছে ২। ৪টী টাকাও নাথাকে,সে কখন অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। তাহার নিকট যে ২। ১ টাকা থাকে,তাহাও শীঘ্র ব্যয় হইয়া যায়। একটী পায়রা যেমন একাকী থাকে না, পালে মিশিয়া বেড়ায়, টাকাও তেমনি বহুসঙ্গী আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। টাকা কড়ি ধন ধান্যকে আমরা লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। অতএব তুমি ভক্তি পূর্ব্বক এ হেন লক্ষ্মী দেবীকে আহ্বান ও পূজা প্রদান কর।

এই যৌবন কাল বিবাহের উপযুক্ত সময়। বিদ্যার্থি বালকদিগকে বিংশতি বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ দিবে না। নীচ ও দুষ্ট সম্বন্ধ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ সৎকুল দেখিয়া শুনিয়া যে পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, হিন্দু সমাজের এ নিয়ম অতি উত্তম। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর কাহারও বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। কেন না এই সময় হইতে কি শারীরিক কি মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের ক্রমশ ক্ষয় হইতে থাকে। এ সময় বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলে, সে সন্তান বড় সতেজ কি দীর্ঘজীবী হয় না, হয় ত শৈশবেই পিতৃ হীন হয়। এবং সে বিবাহিত পত্নী বিধবা ও যাবজ্জীবন দুঃখিনী হইয়া থাকে।

যাহা হউক একুশ বৎসর বয়স্ক যুবার সহিত ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়াই ভাল। ভার্য্যা স্বামীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া তাঁহাকে পূজা ভক্তি করিবেন। নিয়ম পূর্ব্বক চরণামৃত পান, তাঁহার পদরেণু অঙ্গে লেপন ও তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পারিলেই স্ত্রী জন্ম সার্থক হয়। গ্রীষ্মকালে স্বামীর ভোজন সময়ে স্ত্রী পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক বীজন করিবেন। রাত্রিকালে

পতি শয়ন করিলে তাঁহার পাদ সম্বাহন করিবেন। স্বামী সেবা ভিন্ন পতিব্রতা রমণীর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। স্বামীরে লঙ্ঘন করিয়া যে নারী বার ব্রতাদি পরায়ণা হয়, তাহার সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে।

পত্নী যেমন পতি সেবন করেন, পতিও তেমনি সতীর সম্মান করিবেন। শিব সতীকে মস্তকে করিয়া রাখেন। নারায়ণ তুলসীকে শিরে ধারণ করেন। আর আমরা মূঢ় মনুষ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই জানি না, সতীর মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, পুরুষের শুক্র বীজ এবং নারীর শোণিত ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে বীজ সংযোগ হইলেই সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। সুসুন্দর ও জ্ঞানবান ধার্ম্মিক সন্তান লাভের ইচ্ছা করিলে উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও উৎকৃষ্ট বীজের আবশ্যক। স্ত্রী পুরুষের পবিত্র আহার ও পবিত্র চিন্তা অভ্যাস থাকিলে বিফল বাঞ্ছা হইতে হয় না।

পুষ্পবতী যুবতী অতি অশুচি হইয়া থাকেন, তিন দিন তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, এমন কি তাঁহার মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিবে না। তাঁহার হস্তের জল পান কি অন্নাদি আহার করিবে না। এই নিয়ম নিশ্ছিদ্র রূপে

প্রতিপালিত না হওয়ায় সমাজে নানা কুৎসিত রোগের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। যাহা হউক রজস্বলা মহিলারা চতুর্থ দিবসে স্নান করিলে শুচি হইয়া থাকেন। স্নানানন্তর সর্ব্বাগ্রেই সূর্য্য দর্শন ও পতি ধ্যান এবং পতিরেই স্মরণ মনন করিবেন। মধ্য যামিনীতে দম্পতী চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে অনুলেপন ও পুষ্প-মাল্য ধারণ পূর্ব্বক পুষ্পক পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া ঈশ্বরের নিকট দীর্ঘজীবী সুন্দর বলিষ্ঠ গুণবান জ্ঞানী ধার্ম্মিক সন্তান কামনায় উভয়ে যোগ আরম্ভ করিবেন। সেই যোগফলে অবশ্যই সুসন্তান উৎপন্ন হইবে। ঋতুর আট দিন ত্যাগ করিয়া নবম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধান প্রশস্ত। দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ দিনে গর্ভাধানে পুত্র এবং নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিনে গর্ভাধানে কন্যা জন্মে। শুক্রের আধিক্যে পুত্র এবং আর্ত্তব অর্থাৎ শোণিতাধিক্যে কন্যার জন্ম হয়। শুক্র ও আর্ত্তব এই উভয়ের পরিমাণ সমান সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। গর্ভস্থলিতে শোণিত শুক্র দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়। শুক্রাধিক বীজ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, যমজ পুত্র এবং শোণি-

তাধিক বীজ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে যমজ কন্যা হইয়া থাকে। দ্বিধাকৃত শুক্রশোণিতের এক ভাগে শুক্রাধিক্য থাকিলে সন্তান ও অপর ভাগে শোণিতাধিক্য থাকিলে, সন্ততির উৎপত্তি হয়। মিলিত শুক্র শোণিত বহুধা হইলে বহু পুত্র হইয়া থাকে।

শোক, দুঃখ, ক্রোধ ও রোগ ভোগ কালে, অথবা কাম ও লোভাদি রিপুবশে বা মদ্যাদি পান করিয়া, স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই সংযুক্ত হওয়া উচিত নহে। এই অবস্থায় গর্ভাধানে যে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হয়, তাহারা প্রায়ই অন্ধ, বধির, মূক ও খঞ্জাদি বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। গর্ভাধান সময়ে পুরুষ যদি রমণীর ন্যায় নীচে উত্তান হইয়া শয়ন করিয়া বীজ বপন করে, অথবা রমণী আপনি পুরুষকে নীচে শয়ন করাইয়া বীজ গ্রহণ করে, তাহা হইলে, যে পুত্র সন্তান হয়, সে নারীর ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার গোঁপ দাড়ি হয় না। বিশেষতঃ এই প্রকার গর্ভাধানে প্রায়ই নপুংসকের জন্ম হইয়া থাকে। এরূপ গর্ভাধানে কন্যা হইলে, সে পুরুষের ন্যায় আকার প্রকার ও স্বভাব ধারণ করে।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা পূর্ণ করা আবশ্যক। নতুবা গর্ভপীড়া উপস্থিত হইয়া কুব্জ, ম্যুজ, কাণ, খঞ্জ ও বামনাদি বিকলাঙ্গ সন্তান উদ্ভূত হইয়া থাকে। গর্ভ-কালে স্ত্রীলোকের মন যদি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, যদি পবিত্র বস্তু ভক্ষণে, দেবতাদি শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ও ভাগবতাদি ধর্ম্ম কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে, দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট সুশ্রী ধার্ম্মিক সন্তান বা ধার্ম্মিকা সুন্দরী কন্যা হয়। নতুবা গর্ভকালে কলহ ও পাপালাপ করিয়া কাল কর্ত্তন করিলে, কুৎসিত ও অধম সন্তান সন্ততীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর প্রসূতির স্তনে যদি প্রচুর দুগ্ধ না থাকে, অথবা কোন কারণে দুগ্ধ বিকৃত হইলে কি প্রসূতি পীড়িতা হইলে সদ্বংশ-জাতা স্বজাতীয়া শান্তশীলা নির্দ্দোষ-দুগ্ধবতী পবিত্র-চরিত্রা জ্ঞানবতী বুদ্ধিমতী আরোগিণী শোক দুঃখ বিহীনা গুণবতী ধাত্রী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ধাত্রির স্তনের মুখ উৰ্দ্ধ হইলে তাহা পানে বালকের হাঁ বৃহৎ হয় এবং স্তনমুখ লম্বিত হইলে বালকের শ্বাস বন্ধ হওয়া সম্ভব। অতএব উক্ত দুই প্রকার স্তন বিশিষ্ট ধাত্রী অগ্রাহ্য। মনোনীত

ধাত্রী শুভলগ্নে স্নান ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্ব মুখে বসিয়া, বালকের মস্তক উত্তরাস্তে রাখিয়া বালককে কোলে করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম-স্তন ধৌত করত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসৃত করিয়া ফেলিবে। পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বালককে স্তন্য পান করাইবে। মন্ত্রটী এই—

চত্বারঃ সাগরাস্তুভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীর বাহিণঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বল বৃদ্ধয়ে॥
পয়োঽমৃত রসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা॥

অর্থাৎ হে সুভগে! বালকের বল বৃদ্ধির কারণ তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য চারি সাগর দুগ্ধ বহন করুক। হে শুভাননে! দেবতারা যে প্রকার অমৃত পান করিয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃত রসের ন্যায় তোমার স্তন্য পান করতঃ কুমারও সেই প্রকার দীর্ঘায়ু লাভ করুক।

হে যুবক! স্ত্রী পুত্র লইয়া, তুমি এখন গৃহস্থ হইয়াছ। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নিশ্ছিদ্ররূপে প্রতিপালন করিতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতা

মাতার সেবা করা, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখা ও তাঁহাদের দেহান্তে সাধ্যানুসারে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ শান্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কাঙ্গালী ভোজন করান কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পিতা মাতার প্রীত্যর্থে গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করা পুত্রের প্রধান কার্য্য। মাতা পিতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পিতৃ লোকের তর্পণ করা, বার্ষিক শ্রাদ্ধ শান্তি করা ও ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং কাঙ্গালী প্রভৃতিকে শ্রাদ্ধ দিনে অন্ন বস্ত্র দান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

গুরুরগ্নি দ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু।
পতিরেক গুরু স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগত গুরু॥

পরম জ্যোতিঃ ধাম ভগবান্ ভাস্কর ব্রাহ্মণের গুরু। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। একমাত্র পতিই স্ত্রীলোকের গুরু। আর অতিথি সকলেরই গুরু হইয়া থাকেন। অতএব অতিথি সেবা করা গৃহির ধর্ম্ম। যে গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি সেবায় পরাঙ্মুখ বা গৃহাগত অতিথিরে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বৈমূখ করিয়া থাকে, সে পাপির মুখ দর্শনে পাপ হইয়া থাকে। অতএব গৃহস্থের কর্ত্তব্য যে, অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলেই তাঁহার জাতি বিচার না

করিয়া তাঁহাকে গুরু জ্ঞানে যথোচিত সন্মান আদর পূর্ব্বক প্রণিপাত করতঃ স্বহস্তে পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে। এবং যথা সাধ্য ভক্তি সহ আতিথ্য সৎকার করিবে। ভক্তির আধিক্যে বায়ু ব্যজন ও তাঁহার পাদ সম্বাহন করা অতি মহতের লক্ষণ। অতিথি সেবায় গুরুসেবা বা ভগবৎ-সেবার ফল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতিথির প্রীত্যর্থে দাতাকর্ণ স্বহস্তে প্রাণাধিক পুত্রের মস্তক কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

আরবীয় ও য়িহুদীয় লোকেরা অত্যন্ত অতিথি ভক্ত। যীশু বলেন, যাহারা অতি দীন হীন নিরাশ্রয়, বস্ত্রহীন, ক্ষুধাতুর ও পীড়িত লোকদিগের প্রতি দয়া করে, কি সদ্ব্যবহার করে, তাহারা তাহা ঈশ্বরের প্রতিই করে। অতিথি সেবক এবং দুঃখী ও পীড়িত লোকদের উপকারক বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ এ হেন ভারতবর্ষ যে কাল মাহাত্ম্যে এমন শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে কোন্ সাধুব্যক্তির হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? অধুনাতন ভারতবাসিরা মদে, রাঁড়ে, মিথ্য জাঁক জমকে অকাতরে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিবে, কিন্তু দুঃখীর দুঃখ মোচনে

এক পয়সা ব্যয় করিতে হইলে, তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া পড়ে! এরূপ ব্যবহার নাস্তিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে দেশের রাজা নিজে ভিক্ষুক, সে দেশের ভিক্ষুকের অবস্থার পরিচয় আর কি দিব!

সে সব কথায় আর কাজ নাই। যুবক, তুমি এখন আপন দায়ীত্ব বুঝিয়া কর্ম্ম কর। পুরাণে বলে অনন্ত দেবের সহস্র ফণায় পৃথিবী আছে। কিন্তু হে যুবক যুবতি! হে মানব! তোমার এই ক্ষুদ্র শিরে তোমার ঊর্দ্ধতন পিতৃগণ ও অধস্তন সন্তান সকল বাস করিতেছেন। তুমি যদি সৎক্যর্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া পুণ্য ও যশোরাশি উপার্জ্জন কর, তাহা হইলে, তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল হইবে, নতুবা তুমি পাপ কি কোন কলঙ্কিত দুষ্কর্ম্মে ব্রতী হইলে তোমার কলঙ্ক ও অখ্যাতির সহিত তাঁহারা সকলেও কলঙ্ক রূপ দুঃখ সাগরে পড়িয়া যেন মরিয়া থাকিবেন। অতএব মানব! তুমি সামান্য লোক নহ, তোমার কার্য্য গৌরব বিবেচনা করিয়া সতর্ক হইয়া সৎপথে চল। এই পথে চলিবার সম্বল বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞান চৈতন্য। ইহা লাভ করিবার জন্য তুমি সৎসঙ্গ, সদভ্যাস ও সৎ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন কর।

মানবের অহঙ্কারের তুল্য শত্রু আর নাই। ঈশ্বর মনুষ্যের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু তিনি কাহারও অহঙ্কার সহ্য করিতে পারেন না। যখন যাহার অহঙ্কার প্রকাশ হইয়াছে, তখনি দর্পহারি ভগবান, তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব হে অজ্ঞান, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মনুষ্য! তোমার কিসের অহঙ্কার বল দেখি? তুমি এক সময় আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলে, কিন্তু দেখ দর্পহারী হরি সেই দণ্ডেই সেই দেহে তোমাকে মেথরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, মেথর জাতিতে গণ্য করিলেন। তুমি এখন মেথর হইয়া নানা ইতর জাতীয় লোকের পুরীষ, মস্তকে করিয়া বহন করিতেছ! এবং দুই হস্তে তাহা পরিষ্কার করিতেছ। মানব! তুমি একদা বড় রূপের গৌরব করিয়াছিলে! কিন্তু এখন তোমার সেই সুন্দর রূপ কোথায়? তাহা গলিত কুষ্ঠ রোগে খসিয়া পড়িতেছে! পথিক লোক সকল তোমারে দেখিয়া ঘৃণা করত চলিয়া যাইতেছে! তুমি না সে দিন নিজ বলের দর্প করিয়াছিলে? আজ তোমার সে বল বীরত্ব কোথায় গেল? তুমি বাতে পঙ্গু হইয়া আর উঠিতে হাঁটিতে পারিতেছ না। ছার জীব!

তুমি সে দিন ধন মদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরার ন্যায় দেখিতে, গরীবকে দেখিলে পশু জ্ঞান করিতে! আজ তুমি যে গরীব হইয়া ভিক্ষা করিতেছ? ধনিগণ! ইহাতেও কি ধনের অহঙ্কার করিবে? তবুও কি গরীব লোককে পশু বলিবে? মান্যমান ও বিদ্যাবান মনুষ্য! তোমরাও কি অভিমান করিবে? ঐ দেখ, তোমার মানের গোড়ায় ছাই পড়িতেছে! বিদ্বান, তোমার বিএ পাস—এ কি হইল? তুমি এখন উন্মাদ বাতুল হইয়া ভূতের ন্যায় নরদমায় নিক্ষিপ্ত নানা জাতীয় লোকের উচ্ছিষ্ট এমন কি কুকুরোচ্ছিষ্ট ঘৃণিত অন্ন ভক্ষণ করিতেছ! ঈশ্বর সকলি করিতে পারেন, অতএব সর্ব্ব প্রকার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নম্রান্তঃকরণে সেই দয়াময় ভগবানের চরণতলে আশ্রয় লও। রূপ, অহঙ্কার, যশ, বিদ্যা, ধন, জাতিকুল ও যৌবন লইয়া ঈশ্বর রাজ্যে যাওয়া যায় না। ইচ্ছাময়ের পথে যাইতে ইচ্ছা করিলে, দীন হীন কাঙ্গালী ও নিরভিমানী হইয়া, দাসবেশে অর্থাৎ মনুষ্যের দাসত্ব করিতে করিতে যাইতে হইবে। সাংসারিক ও ইন্দ্রিয় জনিত অপবিত্র সুখ সকল পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র দুঃখের ভার উপহার লইয়া, ঈশ্বর দর্শন করিতে

হইবে। যাহাতে আপাততঃ সুখ বোধ হয়, তাহাই পাপ, তাহা ত্যাগ না করিলে পরিত্রাণ নাই। বার বার জনম মরণ রূপ সংসার দুঃখ ও যমালয়ের ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কাম জনিত সুখ ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বর প্রেমে মজিতে হইবে। প্রভুত্ব রূপ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দাসত্ব করিতে হইবে। রাজ্য ধন ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইতে হইবে। মান মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করত হেয়তা অবলম্বন করিতে হইবে। পর-নিন্দারূপ সুখ ছাড়িয়া পর প্রশংসা করিতে হইবে। পর-নিন্দা মহাপাপ। নিন্দুক ব্যক্তি পাপের পাপ মুক্ত করিয়া, সেই পাপ সে নিজে ভোগ করে।

সাধু কবির বলেন—

নিন্দুক বেচারা মর্ গিয়া
কবিরা বৈঠ্‌কে রোয়।
পাপ সাফা কর্‌তা ধুবি
য্যায়্‌সা ময়লা ধোয়॥

পৌঢ়াবস্থা

প্রৌঢ়।

মানব যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে, প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত নব নব বাসনা ও সুখভোগের উত্তাল তরঙ্গ-মালা অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়া আইসে। যদিও একেবারে নিবৃত্তি না পাউক, তথাপি সুখ-সম্ভোগের মোহিনী মূর্ত্তি আর ততটা মনোহরণ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি যৌবনের ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে ছিল, সে এখন জানিতে পারিল, আমি বিষম সঙ্কট স্থানেই পতিত হইয়াছি, কিরূপে পরিত্রাণ পাইব? এই ভাবিয়া পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। এখন সংসারের গুরুত্ব বোধ হইল। যৌবন কালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহার মানসে বিন্দুমাত্রও স্থান পাইত না, তাহা এখন তাহার মানস স্থলী অধিকার করিতে লাগিল। যাহারা যৌবনের প্রবল মদে প্রমত্ত, সুতরাং কুপথে গমন করিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকে শত্রু জ্ঞান করিত, তাহারা এখন তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এইকালে যৌবন সুলভ চঞ্চল বুদ্ধি অনেক পরিমাণে স্থির হইয়া আইসে, সুতরাং কর্ত্তব্য ভার বহন

করিবার নিমিত্ত এখন মস্তক পাতিয়া দিল। যৌবন সীমায় উপনীত বলীবর্দ্দগণ যেমন প্রথমে হলকর্ষণাদি না করিয়া যথেচ্ছ ভ্রমণে বাসনা করে, সেই রূপ তৎকালে যুবকগণ কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে ইচ্ছুক না হইয়া যেখানে সুখের ছায়া অবলোকন করে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে ভাল বাসিয়া পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যৌবন-মত্ত সুখাভিলাষী মনুষ্যগণ সুখের কুহকে পতিত হইয়া যে সকল কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জন্য প্রৌঢ়াবস্থায় অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া সেই সকল পাপকার্য্য হইতে বিরত হয়। পাপের সহিত ব্যাধির সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য। পাপ করিলেই দৈন্য, দুঃখ ও ভয়ঙ্কর শোক তাপ উপস্থিত হইয়া পাপাচারী ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে থাকে। এখন পাপ করিলেই ভুগিতে হয়, ইহা স্বয়ং ভুগিয়া ভুগিয়া জানিতে পারে। সুতরাং পাপের দিকের প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়া এখন তাহার কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। "প্র পূর্ব্বক বহ ধাতু ত প্রত্যয় করিয়া "প্রৌঢ়" (প্র-ঊঢ়) এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে" মানবগণ এই অবস্থায় কর্ত্তব্য ভার

বহন করে বলিয়া এই অবস্থাকে প্রৌঢ়াবস্থা বলে। এই-কালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সন্তোষ সাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, পতিব্রতা পত্নীর হিত বাক্য মিষ্ট বোধ হয়। এখন অতি অল্পকারণেই লোহিত লোচন হয় না। আত্মীয় স্বজনের সুখের নিমিত্ত বৈষয়িক কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি মানস অর্পণ করে। ন্যায় পথে পাদচারণা করিতে প্রবৃত্তি হয়। যৌবন কালে অবিবেকের দাস হইয়া সুখের মোহনে যে সকল কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, এখন তন্নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া থাকে, মনে করে এখন আমার যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তখন যদি এরূপ থাকিত, তবে সেই সেই কার্য্যটা করিতামনা। এখন পরের উপকার সাধন করিতে এবং জনসমাজে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষ জন্মে।

এক ব্যক্তি এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার পিতৃ দত্ত অতুল বিভব আপনি কিরূপে নষ্ট করিলেন? প্রৌঢ়ব্যক্তি বলিল ভাই! আর ও কথা কহিও না, এখন আমি অনুতাপেই মরিতেছি। তখন আমার যৌবন কাল, আমি জানিতাম না যে, এই বিষয়

রক্ষা না করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আর আমার বিষয় রক্ষার অবকাশ ছিল না, বিষয় রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতেও এক বিন্দু সময় পাইতাম না। প্রভাতের প্রায় এক প্রহর পরে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত, শৌচাদির পর দেখি গাড়ি প্রস্তুত, অমনি দুশ্চরিত্র সঙ্গিগণের সহিত স্নান করিতে যাইতাম, তাহারা নানা প্রকার মনোরঞ্জনের কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখিত, স্নানান্তে উত্তম উত্তম আহার প্রস্তুত দেখিয়া তখনি আহার করিয়া শয়ন করিতাম। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর উত্থিত হইলে, উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণ আমার মনোহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপ নানা প্রসঙ্গে ও পরসঙ্গে দিন রাত্রি কাটিয়া যাইত। তখন মদে ও আমোদে মত্ত হইয়া কি যে করিতাম, তাহা আমার ঠিক থাকিত না, নিশাবসানের সময় আমার নিদ্রা আসিত, আবার এক প্রহর বেলার সময় উঠিতাম, এইরূপে আমার অবকাশ ছিল না। ওদিকে ধূর্ত্তগণ আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, আমি কিছুই জানিতে পারিতামনা, জানিতে দিতও না। কখন কখন তিলকধারী পুরোহিত মহাশয় মেয়েদের ব্রতের দক্ষিণা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার নিযুক্ত কর্ম্মচারীর

নিকট আসিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি তুচ্ছ জ্ঞান করিতাম। তিনি কখন কখন আমাকে কহিতেন—বাবু মহাশয়! আপনি আপনার পিতা ও পিতামহের বিষয় সকল ও কীর্ত্তি কলাপ বজায় রাখুন, নচেৎ সকলি নষ্ট হইয়া যাইবে; আমি কিন্তু তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করিতাম, এবং তিনি এখান হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি, এইরূপ মনে মনে করিতাম, তিনিও "আমি বিরক্ত হইতেছি" ভাবিয়া সত্বর নির্গত হইয়া যাইতেন। এখন তাঁহাদিগকে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। আমার পূর্ব্বসঙ্গী যাহারা আমাকে কুহক জালে ফেলিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে, নরকে দৃষ্টি পাত করিতে ইচ্ছা হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আর চাহিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় না, এখন আমি কষ্টে সৃষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। অতএব বলিতেছিলাম ভাই! এখন আর ওসব কথা কহিওনা, আমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখন আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়।

প্রৌঢ়াবস্থায় লোকের জ্ঞানের পরিপাক হইতেও আরম্ভ হয়। এই কালেই লোকে বিশেষ কীর্ত্তি কলা-

পের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই কালেই কবির কবিত্বের এবং যুদ্ধ কারীর যুদ্ধ জ্ঞানের, বণিকের বাণিজ্য জ্ঞানের, ব্যবহারাজীবীর ব্যবহার জ্ঞানের, কৃষকের কৃষি-জ্ঞানের পরিপাক হইয়া তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। এই কালেই মানবগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়, এবং অর্থ সঞ্চয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকে।

প্রৌঢ়াবস্থায় যথা সাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ধন উপার্জ্জন পূর্ব্বক সন্তান ও পরিবার প্রতিপালন, দান, অতিথি সেবা, গুরু সেবা এবং পুরুষার্থ লাভের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া ধর্ম্মতত্ব সংগ্রহ করিতে এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যত্ন করা একান্তই আবশ্যক। এই কালে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের প্রতি মন সমর্পণ পূর্ব্বক ন্যায় পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উত্তম রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ এবং ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের ও অর্থের সঞ্চয় সহকারে সুখ সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে।

যদি ঈশ্বরের নিকট নির্ম্মল থাকিয়া ন্যায় পথে অর্থ উপার্জ্জন করা হয়, তবে ঐ অর্থ অল্প হইলেও তাহা দ্বারা

দুঃখির উপকার ও পিতৃ কার্য্যাদি করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইতে পারে। তদ্বিষয়ে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কোনও রাজা দেশ লুণ্ঠনাদি দ্বারা অন্যায় পথে যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই শ্রাদ্ধাদি পৈত্রিক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া পুরোহিতকে প্রদান করিতেন। পুরোহিতের সেই অর্থ স্থির বাঁধিত না, কোন রূপে তাহা ব্যয় হইয়া যাইত। একদিন পুরোহিত-পত্নী আপন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের রাজ বাড়ী হইতে অনেক জিনিষ পত্র ও টাকা কড়ি আইসে, কিন্তু কিছুতেই বাস বাঁধেনা কেন? পুরোহিত কহিলেন কল্যাণি! রাজার লুট পাটের টাকা কড়িতে কি কখন আয় দেখে? ঘটনা ক্রমে সেই কথা রাজার কানে উঠিলে, রাজা দীন হীন মজুরের বেশে দেশান্তরে গিয়া এক নগরে দেখিতে পাইলেন যে, এক কর্ম্মকার লৌহ পুড়াইয়া আগুণের মত করিয়া, তাহা বলপূর্ব্বক বৃহৎ লৌহ মুদ্গার দ্বারা পিটিতেছে। কর্ম্মকারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্মধারা বহিয়া পড়িতেছে, তথাপি বিশ্রাম নাই। রাজা কৌশল ক্রমে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া একটি টাকা উপার্জ্জন করিলেন। তখন গৃহে আগমন পূর্ব্বক

৷৷০ আট আনার তিলাদি উপকরণ ক্রয় করিয়া পিতার দিবসিক শ্রাদ্ধ করিলেন এবং আট আনা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত সেই আধুলিটি গৃহিণীকে দিলেন। একদিন এক প্রতিবেশী নগরান্তর গমন করিতেছিল, এমত সময়ে পুরোহিতের বালক পুত্র খেলনার জন্য কাঁদিতে লাগিল, তখন গৃহিণী সিকার হাঁড়ি হইতে সেই আধুলিটি বাহির করিয়া একটি পশমের বিড়াল আনিতে দিল। আট আনায় নূতন বিড়াল না পাইয়া, একটি পুরাতন বিড়াল পাওয়া গেল। কিছু দিন পরে সেই খেলনার বিড়ালটী ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে তিনটি মণি পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ অনেক চিন্তার পর রাজার নিকট সেই মণি লইয়া গেল। রাজা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, সেই আধুলিটির দ্বারাই পুরোহিতের এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে। রাজা সেই মণি গ্রহণ করিয়া মণির মূল্য স্বরূপ বহুতর ভূসম্পত্তি ও বিস্তর অর্থ প্রদান করিলেন। পুরোহিতের মহাসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজাও অন্যায় পথ ছাড়িয়া দিয়া ন্যায় পথে অর্থ উপার্জ্জন এবং ধর্ম্ম অনুসারে প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন।

এ কথা মিথ্যা নহে, ইহা ঐশ্বরিক লীলা। যে ধর্ম্ম পথে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহার সংসারে অপ্রতুল হয় না। অধর্ম্মের অর্থে সর্ব্বদাই অকুলান হইয়া থাকে। অতএব হে প্রৌঢ়গণ তোমরা সৎপথে থাকিয়াই অর্থ ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে। প্রৌঢ়কালে যে ব্যক্তি উক্ত রূপে সংসার নির্ব্বাহ করে, তাহার বৃদ্ধকাল অর্থাৎ জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

অতি প্রৌঢ়।

তন্ত্র মতে আট চল্লিশ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের দেহের অবস্থার নাম অতি প্রৌঢ়। এই কালে প্রৌঢ়াবস্থার ন্যায় অনেক কার্য্য সাধন হয়। বুদ্ধি বিশেষ রূপে পরিপক্ক হয়, দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতির প্রতি ভক্তি দৃঢ়তর হয়। মানবগণ এই সময়ে ঈশ্বরের প্রতি অনেক পরিমাণে মন সমর্পণ করে। বাক্য, স্নেহময় ও মধুর হয়। সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিধি দিয়াছেন যে "বনং পঞ্চাশ তো ব্রজেৎ" পঞ্চাশৎ

বৎসর বয়সের পর বনে গমন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন কর্ত্তব্য, কিন্তু বর্ত্তমান কালে তদনুসারে কাহাকেও আচরণ করিতে দেখা যায় না। হে অতি প্রৌঢ়গণ। এই সময়ে নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করা তোমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। দেখ তোমাদের দুই একটি দন্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, কেশও ক্রমশঃ পাকিতেছে, আর অধিক সময় নাই ভাবিয়া প্রস্তুত হও। দেবতা পূজা, ধ্যান, জপ, তপ, দান, পিতৃযজ্ঞ, অতিথি সেবা ও যোগ এই সকলের অনুষ্ঠান কর, সদ্গতি লাভ হইবে। যদি কেহ এক জন নীচ, কুলাঙ্গার ও মূর্খ ব্যক্তির শরণাগত হয়, তাহা হইলে সেও প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে তুমি যদি সেই পূর্ণ জ্ঞানময় সৎ স্বরূপ পরম দয়াল পরম পুরুষের শরণাগত হও তবে তিনি কি তোমাকে রক্ষা করিবেন না? অবশ্যই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। এই অতি প্রৌঢ় কালে তুমি ঈশ্বর পূজার অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না। শুভস্য শীঘ্রং। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। জানি না কখন কোন্ গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অতএব এ

বিষয়ে আর আলস্য করা উচিত নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন।

অজরামর বৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

বিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর (আমার বার্দ্ধক্য হইবেনা) এবং অমর (আমি মরিবনা) এই রূপ ভাবিয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবে, আর মৃত্যু যেন আমার চুলের গোচায় ধরিয়া আছে, এখনি আমারে লইয়া যাইবে, এই রূপ ভাবিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব ধর্ম্মোপার্জ্জনে সত্বর তৎপর হও।

তুমি এই কালে পাছুদিকে তাকাইয়া দেখিয়া বালতেছ, আমি এত পরিশ্রমে এত যত্নে বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম এবং প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলাম, তথাপি সুখী হইতে পারিলাম না, কিন্তু এরূপ মনে করা কদাচই কর্ত্তব্য নয়। মনীষীগণ বলিয়াছেন ;—

বিদ্যানবদ্যা কৃতিভির্নহেয়া
নিরক্ষরান্ বীক্ষ্য ধনাধিনাথান্।

স্বর্ণাবতংসাং গণিকাং সমীক্ষ্য
কুলাঙ্গনা কিং কুলটা ভবেয়ুঃ ॥

যাঁহারা বিদ্যা লাভে কৃতী হইয়াছেন তাঁহারা নিরক্ষর মূর্খ দিগকে ধনের অধিপতি দর্শন করিয়া আপনার বিদ্যার প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। বেশ্যাগণকে স্বর্ণাভরণ পরিধান করিতে দেখিয়া কুলাঙ্গনাগণ কি কুলটা হইবেন? তুমি যদি বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাক উত্তম, বেদ ও পুরাণ পাঠাদি দ্বারা ঈশ্বরের আলোচনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। যদি তুমি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী না হইয়া থাক তবে পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বিচারে তৎপর হও। সৌভাগ্য ক্রমে তুমি এখন পর্য্যন্তও জীবিত আছ, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এখন হইতেই বিশেষ রূপে পাপালাপ ও পাপচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেবারেই ঈশ্বর পরায়ণ হও। তুমি যদি যৌবন, প্রৌঢ় ও অতি প্রৌঢ়াবস্থায় সদাচার ও ঈশ্বর পরায়ণ না হইয়া কদাচারে রত ও পাপচিন্তা রূপ নরক হ্রদে নিমগ্ন হইয়া থাক, তবে তন্নিমিত্ত এক্ষণে জগাই মাধাইয়ের ন্যায় অকৃত্রিম অনুতাপ পূর্ব্বক সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট

ক্রন্দন এবং পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যাঁহাদের নিকট অপরাধী আছ, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া অতি দীনভাবে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর, নতুবা আর কিছুতেই নিস্তার নাই। পাপ চিন্তা, পাপালাপ ও পাপাভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; এমন কি নিতান্তই অসাধ্য বলিলেও অসঙ্গত হয় না। এ জন্য জ্ঞানিগণ শৈশবকাল হইতেই মনুষ্যদিগকে সদাচরণ ও সদভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। জ্ঞানি, পণ্ডিত, সাধু ও প্রাচীন এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনগণের উপদেশ অবহেলা করিলে নিশ্চয়ই ইহকাল ও পরকালে দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কেবল উপদেশে বড় ফললাভ হয় না, দৃষ্টান্ত সংযুক্ত উপদেশে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যা দৃষ্টান্ত দিয়া উপন্যাস লিখিয়া উপদেশ দিলে, কিছুই ফল হয় না, বরং সেই মিথ্যা কথা রূপ পাপাশ্রয়ে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। এই জন্য আজকাল উপন্যাস জগতের এত দুরবস্থা। যাঁহারা মিথ্যা নাটকের অভিনয় ও উপ-ন্যাস প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সুদূর প্রান্তরে এবং

মরুভূমিতে মরীচিকায় জল ভ্রম হয়, কিন্তু তাহাতে কি শ্রান্ত পান্থগণের পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে ? কিছুই না ; অধিকন্তু তাঁহারা মারিচ নিশাচর মায়া মৃগের ন্যায় মরীচিকা মায়া জলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া আরো ক্লান্ত হইয়া পড়েন ; তদ্রূপ মিথ্যা নাটক ও মিথ্যা উপন্যাস সকল জানিবেন। এই সকল মিথ্যা নাটক ও উপন্যাসেই মনুষ্য প্রধান পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় পশুশালা করিয়া তুলিল। এই বেলা সকলকার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ।

সত্যের তুল্য মূল্যবান পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই, যেহেতু ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। অতএব সত্যেই অনুরক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মুখুর্য্যা মহাশয়—ইহাঁর নাম ধাম আমরা প্রকাশ করিলাম না। ইনি অতিশয় কৃষ্ণকায় পুরুষ ছিলেন। তিনি লম্পটতা ও দস্যুতায় বিশেষ পটু ছিলেন, দুষ্ট বলিয়া গ্রামের ভদ্রাভদ্র সকল লোকেই তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন। মুখুর্য্যা মহাশয়কে অতি প্রৌঢ়া-বস্থায় ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করিতে হইয়াছিল। এবং পীড়িত ও শয্যাগত থাকিয়াও তিনি দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ

করিয়াছিলেন। আসন্ন মৃত্যু সময়ে তাঁহাকে গঙ্গা-তীরস্থ করা হইলে, অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "মুখুর্য্যা মহাশয়! গঙ্গা দর্শন করুন. আর এই সময়ে একবার হরিনাম করুন।" তাহাতে তিনি এমন অশ্লীল বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া শ্রোতৃবর্গকে পলায়ন করিতে হইল। যে সকল কুলবধূ জল তুলিতে গঙ্গায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জায় যেন পৃথিবীকে দ্বিধা করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িতা হইলেন।

যিনি ঈশ্বর ও ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, পরলোকে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। মুখুর্য্যা মহাশয়ের পরকাল কি রূপ হইবে তাহা ভগবানই জানেন। এই জন্য আমরা বারবার বলিতেছি, মনোমধ্যে পবিত্রভাবকে কৈশরাবস্থা হইতে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিবে। যাঁহারা বলেন, বাল্য, কৈশর কি যৌবন কাল ধর্ম্ম চিন্তার সময় নহে, বার্দ্ধক্য সময়ই ধর্ম্মালোচনার উপযুক্ত কাল; তাঁহারা ভ্রান্ত। বাল্য কাল হইতে অভ্যাসবশতঃ যদি অপবিত্র ভাবটী হৃদয়ে একবার বদ্ধ মূল হইয়া যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থায় সহস্র চেষ্টায়

তাহা উন্মুলিত করা দুষ্কর হইবে। আমাদিগের উক্ত মুখুর্য্যা মহাশয়ই তাহার বিশেষ প্রমাণ।

বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থা।

আমাদের সেই সাধের নবীন শিশুটী আজি বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হইলেন। পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ ইনি মনুষ্যের বহির্ভূত কোন কার্য্য করেন নাই। বাল্যাবধি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রবীণ লোকদের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষায় সর্ব্বদা যত্ন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা এই পুস্তকে মানবের ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দশ দশা অর্থাৎ মাতৃক্রোড়স্থ সন্তান, শৈশবাবস্থা, বাল্যাবস্থা, পৌগণ্ডাবস্থা, কৈশরাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, অতি বৃদ্ধাবস্থা, জরাবস্থা ও মৃতাবস্থার বিষয় প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু মানবের তিন অবস্থাই প্রধান। যথা—বালক, মধ্য বয়স্ক ও বৃদ্ধ। ষোড়শবর্ষের ন্যূন বয়স্ক মনুষ্যকে বালক, ষোড়শ বর্ষের ঊর্দ্ধ সপ্ততি বৎসরের ন্যূন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে

বৃদ্ধাবস্থা

মধ্যবয়স্ক এবং সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে একশত বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানবকে বৃদ্ধ বলা যায়।

অবস্থা ভেদে বাল্যকালের তিনটী দশা দৃশ্য হইয়া থাকে। যথা দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্ন ভোজী এবং অন্নাহারী। এক বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্ন ভোজী এবং দুই বৎসরের পর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত অন্নাহারী।

মধ্য বয়স্ক মনুষ্য আবার চারি প্রকার। যথা বর্দ্ধনশীল, যুবা, পূর্ণবীর্য্য ও ক্ষয়শীল। বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বর্দ্ধনশীল, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা ও চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের রক্তের তেজ, বীর্য্য, ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহাদি অবিচলিত ও পরিপূর্ণ থাকে। তার পর ক্রমে ক্রমে সত্তর বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত মনুষ্যের রক্ত, বল বীর্য্য, ধাতু, ইন্দ্রিয় ও উৎসাহাদি সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সত্তর বৎসরের পর হইতে মনুষ্য প্রকৃত বৃদ্ধ দশায় উপনীত হন। বৃদ্ধের দুরবস্থা পরিশিষ্টে কিঞ্চিৎ বর্ণিত আছে বলিয়া এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

বাল্যং বৃদ্ধি শ্ছবির্মেধাত্বগ
দৃষ্টিঃ শুক্র বিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো
জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥

অর্থাৎ বাল্য, বৃদ্ধি, শোভা, মেধা ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, চিত্ত ও জীবন, প্রতি দশবৎসরে হ্রাস হইয়া থাকে।

যাহা হউক বৃদ্ধাবস্থায় অনেককে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয় সত্য বটে, কিন্তু সেটা কার দোষ? সে বিষয়ে সেই বুড়োদেরই কি সম্পূর্ণ দোষ নয়? তাঁহারা যদি আজন্ম ঈশ্বরানুগত থাকিয়া নিশ্ছিদ্ররূপে নৈতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে কথনই তাঁহাদিগকে বার্দ্ধক্য জনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না। বাল্যকালে বিদ্যা, যৌবনে ধন সঞ্চয় না করিলে বৃদ্ধকালে কষ্ট পাইতেই হইবে; ইহা সাধারণ নিয়ম। যাহারা এ নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহাদের দুঃখ অনিবার্য্য। আজন্ম পবিত্রভাবে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নানা পীড়ায়

অভিভূত হইতে হয়, সুতরাং কর্ম্মদোষে সেই সকল বুড়ার অদৃষ্টে কষ্টের সীমা থাকে না। যাঁহারা বিবেচক, বুদ্ধিমান, তাঁহারা কৈশরকাল হইতেই গুরুজনের উপদেশ মত সৎসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক শারীরিক, নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম নীতি প্রতিপালন করিয়া শতাধিক বর্ষ বয়ক্রম কালে সুস্থ শরীরে বিনা কষ্টে পরমসুখে কালযাপন করিয়া থাকেন। অদ্যাপি এরূপ ভাগ্যবান বৃদ্ধের অসম্ভব নাই। জগতে পাপের প্রাবল্যে এবং ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে বৃদ্ধকালেই লোকের রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণাদি নানা কষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব একদা এক স্থবির মূর্ত্তি ও শব দর্শনে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করতঃ রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্রাদি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক শান্তি পথের পথিক হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর বাদসাহের মন্ত্রি শ্রীরূপ ও সনাতন গৌরাঙ্গ-প্রেমে মগ্ন হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালী ও পথের ভিখারী হয়েন। এ রূপ সহস্র সহস্র মহাত্মার পুণ্য নাম ও মহদ্দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল সাধু পুরুষ পরম পুরুষের পদাশ্রয় পাইবার আশায় রাজ্য, ধন ও সুখরাশি মল মূত্র পরিত্যাগের

ন্যায় হৃষ্টান্তঃকরণে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আর মাদৃশ দীন দুঃখী অভাগারা সেই সাধুত্যক্ত মল মূত্র বৎ ধনাশয়ে মূঢ়ের দাসত্ব ও উপাসনা করিয়া পরম পিতা পরমাত্মার উপাসনায় বিমুখ হইতেছি! মূঢ় জীবনের কি কিছুতেই চৈতন্য হইবে না?

যাহা হউক, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ও জরাবস্থা ঈশ্বর সৃজিত। মঙ্গলময়ের হস্ত হইতে কখনই অমঙ্গলের কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং এই কালত্রয় নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের সেবা আরাধনা করার উপযুক্ত সময় এবং মনুষ্য জীবনে ইহাই প্রার্থনীয় বিষয়। 'কলৌ গতৌ ধন্য' এ বচন সত্তেও অল্প বয়সে মৃত্যু, কি না কেবল মাত্র আসা যাওয়াকে আমি ভাল বলিতে পারি না, আর অভক্তের শতায়ু লাভকেও ভাল বলি না। জীবনং কৃষ্ণ ভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানিচ, নতু কল্প সহস্রাণি ভক্তি হীনঞ্চ কেশবে। দুর্লভ মানুবদেহ ধারণ করিয়া যদি ভগবৎ ভজন করিতে না পারিলাম, তবে সে জন্মই বৃথা! সে গর্ভ স্রাবের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, অথবা তাহার জীবন মরণ উভয়ই সমান ও অতি অকিঞ্চিৎকর।

বার্দ্ধক্যাবস্থায় মনুষ্যের বিদ্যালাভ বা ধনার্জ্জনের, কি

অতিবৃদ্ধাবস্থা

দাম্পত্য প্রেম বিকাশের সময় নহে। এখন বাল্য,কৈশোর ও যৌবন কালের ভালমন্দ কৃত কর্ম্ম সকল আলোচনা করিয়া মনোমধ্যে কখন হর্ষ ও কখন বা ধিক্কার গ্রস্ত হইতে হয়। জীবন ধারণে যদি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহা স্মরণে আহ্লাদ ও পূর্ব্ব কৃত পাপ কর্ম্ম মনে হইলে, অনুতাপ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যের বাল্য,কৈশোর ও যৌবনকাল বিফলে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আন্তরিক দুঃখ হইতে থাকে।

যাহা হউক বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধাবস্থায় অনেকেই প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী জানিয়া, পাপ কার্য্যে বিরত ও ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত হন। এ সময় সাধু সঙ্গ করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে এবং সর্ব্ব ভূতে আত্মবৎ প্রেম করিতে ইচ্ছা হয়। যৌবন কালে বুদ্ধি দোষে কাহারও স্বার্থ হানি করিয়া থাকিলে, কিম্বা কাহাকেও মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়া থাকিলে, তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুতাপ উপস্থিত হইতে থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয় বলিয়া, এ সময় বিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। বিজ্ঞতা উত্তম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এই

বিদ্যাভিমানই অনেকের নরকের কারণ হইয়া উঠে। এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ অবিশ্বাস করিবেন না। এই পুস্তকে যে সকল অদ্ভুত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার একটীও মিথ্যা নহে, সকলি সত্য। আশ্চর্য্যময় ঈশ্বর রাজ্যে সকলি আশ্চর্য্য। অবিশ্বাসী নাস্তিকের মনে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য জ্যোতি বিভাসিত হয় না বলিয়া, তাহারা এ সকল দেখিতে পায় না, তাই তাহারা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য শক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না।

কুরু পাণ্ডব সমরে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের নিধন হইলে পর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে চক্ষুদান করিয়া তাঁহার মৃত পুত্রগণের মুক্ত আত্মা সকল আনাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। নাস্তিকগণ এ কথায় প্রত্যয় করিতেন না, কিন্তু এখন আমেরিকা দেশে ম্লেচ্ছাচার্য্যেরা ঐরূপে মুক্তাত্মা সকল আনয়ন করিয়া থাকেন। যোগবলে যে অনেক অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে, তাহা আর এখন কেহ বড় একটা অবিশ্বাস করিতে চাহেন না।

কোন গ্রামে বিদ্যাভিমানী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুটী পুত্র সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণ

বয়ঃধর্ম্মে কিঞ্চিৎ অসুস্থ ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি একজন হরি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু দোষ এই যে, কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইলে তিনি সকল স্থানেই আপনাকে দুর্ব্বল ও অসুস্থ্য জানাইয়া সর্ব্বাগ্রেই অর্থাৎ অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বেই নিজে আহার করিয়া লইতেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহার শ্রাদ্ধ শান্তি করেন। এক বৎসর পরে এক দিন রাত্রিকালে ঐ ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহ মধ্যে নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটী কুকুর তাঁহাকে বলিতেছে, "অমুক! তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার পিতা ছিলাম, ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে সকল স্থানে উদর পূর্ত্তি করিতাম বলিয়া সেইপাপে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া কুৎসিত ভক্ষণ করিতেছি। হরিনামে রুচি থাকায় ভগবৎ কৃপায় আমি জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি অগৌণে গয়াধামে গমন করত গদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া পুত্র কার্য্য কর, তাহা হইলে আমারত সদ্গতি হইবেই হইবে, তোমারও পরমগতি লাভ হইবে। স্বপ্ন দর্শক পরদিন প্রাতঃকালে আপনার দ্বারদেশে স্বপ্নে দৃষ্ট কুকুরের মত ঠিক একটী কুকুরকে

দেখিতে পাইলেন এবং কুকুরটী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছে দেখিয়া তিনি স্বপ্ন সত্য মনে ভাবিয়া সেই দিনেই গয়ায় গমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে কুকুর যোনি প্রাপ্ত তাঁহার পিতা মুক্তি লাভ করিলেন।

জরাবস্থা।

জরাবস্থায় দুষ্কৃতি দুর্ভাগ্য জীবের দুর্গতির সীমা থাকেনা। ইহাঁরা প্রায়ই অপুত্রক নিরাশ্রয় দুঃখী, রোগী ও পথের ভিখারী। ইহাঁদের হরিনামে রুচি নাই। মৃত্যু-অন্তে পরিণামে গঙ্গাপুত্রগণ ইহাঁদের দুর্গতি রূপ গতি করিয়া থাকে। কিন্তু সুকৃতি ভাগ্যবান মনুষ্যের সুখের ও আহ্লাদের পরিসীমাও নাই। ইনি সবলকায় সুস্থ শরীরে নিয়ত পবিত্র ভাবে থাকিয়া হরিনাম সাধন করেন। পুত্র, পৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতি পরিজনে পরিবেষ্টিত ও তাঁহাদের দ্বারা পরিসেবিত হয়েন।

মৃতাবস্থা

মৃত্যু।

'মৃত্যু' নাম শুনিলেই লোকে ভীত হয় কেন? মৃত্যু কি পদার্থ? মৃত্যু কি করে?—মৃত্যু জীবগণের প্রিয় জীবন বিনাশ করে। এই মানুষ কথা কহিতেছিল, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া চিরকালের জন্য তাহারে কোথায় লইয়া গেল! সর্পের নির্ম্মোকের ন্যায় মনুষ্যের দেহ পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহার চৈতন্যময় আত্মা কোথায় চলিয়া গেল! কত প্রকারে যে মৃত্যু হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু সচরাচর অস্ত্রাঘাত, উচ্চ হইতে পতন, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, জল-মজ্জন বিষ প্রয়োগ, প্রস্তরাদি চাপন ও বন্ধন এবং অন্যান্য গুরুতর আঘাত, শ্বাস রোধ ও অতি বৃদ্ধ ইত্যাদি দ্বারাই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। মৃত্যু ইন্দ্রিয়গণের শক্তি ও প্রাণ বায়ু বিনাশ করিয়া ইহ জন্মের মত তাহার জীবন-লীলা ফুরাইয়া দেয়। এমন মৃত্যুকে কে না ভয় করিয়া থাকে?। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়া আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইবেই হইবে, এরূপ জানিয়া শুনিয়াও মানবগণের চৈতন্য হয় না। বিষয়ে একান্ত আসক্ত থাকিয়া মৃত্যুকে ভুলিয়া

যায়, জন্মিয়া অবধি প্রতিক্ষণেই এক একটু করিয়া আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তাহা আর কাহারও মনে থাকে না। তজ্জন্যই এত অহঙ্কার গর্ব্ব, কত দর্প, অভিমান ও রাগ, বিদ্বেষ, বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকি। যাহা হউক মৃত্যু একদিকে অপ্রিয়কারী হইলেও ভাবিয়া দেখিলে একদিকে উপকারীও বটে, কেন না, মৃত্যুর তুল্য দুঃখহারক পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা জন্মিয়া অবধি কত দুঃখ ও কত যে কষ্ট ভোগ করি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু মৃত্যু একবার প্রিয় সুহৃদের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেই সকল দুঃখ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যদি কেহ বলেন যে, দুঃখের সঙ্গে আমাদের সুখও ত বিনষ্ট হয়; তিনি জানিবেন যে, মেঘ ও বাত্যাদি বিশিষ্ট তামসী নিশার ঘোর অন্ধকারে যেরূপ এক একটি খদ্যোত দৃষ্ট হয়, সংসারের সুখও তদ্বৎ। যদি ঘোর অন্ধকার রূপ দুঃখরাশি বিনাশ পায়, আর তাহার সঙ্গে একটু সুখ পদার্থও নষ্ট হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই স্বীকার্য্য। অহো! মানব জীবনে যখন যন্ত্রণা রাশি প্রবেশ করে, তখন সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই যন্ত্রণা এতই কষ্ট দায়ক হয়, যে, মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণাও তখন

তুচ্ছ জ্ঞান হয়, তখন সে মৃত্যুকে পরমমিত্র বলিয়া আহ্বান করে, যখন তাহাকে দেখিতে না পায়, তখন চিতা যোগে, উদ্বন্ধনে, জীবনে বা দহনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সমস্ত দুঃখ এককালে নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। মৃত্যু অগ্রবর্ত্তী আছে বলিয়াই বিজ্ঞগণ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, নতুবা বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ সকলেই যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইত। মৃত্যু আছে বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের প্রতি মন সমর্পণ করি, তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত সজ্জিত হই। যেমন কোন রাজা বা ধনী ব্যক্তির নিকট গমন করিতে হইলে উপযুক্ত রূপ সজ্জা ও পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন, নতুবা দ্বারবানেরাই ফিরাইয়া দেয় এবং রাজাও সাক্ষাৎ করেন না; তেমনি রাজাধিরাজ সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরের নিকট গমন করিতে হইলেও সেই-রূপ সত্য, সরলতা, নিরভিমানিতা ও দয়া ধর্ম্মাদি পুণ্য ও পবিত্রতা রূপ সজ্জা ও পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, নতুবা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। মন জানে মৃত্যু রহিয়াছে, যদি ঈশ্বর রাজ্যে গমন করিতে পারি, তবেই মঙ্গল, নতুবা ঘোরতর দুঃখ

সাগরে পতিত হইয়া চিরকাল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তদুপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হইতে যত্ন করিয়া থাকে। ঈশ্বরের নিকট গমনের সজ্জা ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বৈরাগ্য ও উপাসনাদি অবলম্বন করা আবশ্যক।

ঈশ্বর মৃত্যুকে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন। মৃত্যু কালে যে মানব যাহা স্মরণ করিবে সে, সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে রাজর্ষি ভরত মৃত্যুকালে হরিণের চিন্তা করিয়া মৃত্যুলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পর জন্মে মৃগ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "জপ তপ কর কি? মরণ হুঁসার" এ বাক্যের বিলক্ষণ অর্থ গৌরব আছে। আমরা যদি মৃত্যু কালে কোন রূপে ইষ্ট দেবতার স্মরণ বা চিন্ময় ব্রহ্মের ধ্যান করিতে পারি, তবে আমরা নিশ্চয়ই সদ্গতি বা মুক্তিলাভ করিব সন্দেহ নাই। কখন যে কিরূপে কাহার মৃত্যু হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ গর্ভে, কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে, কেহ বার্দ্ধক্যে, কেহ কেহবা অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অতএব বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান মনুষ্য মৃত্যুর জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকি-

বেন। নতুবা মৃত্যু সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ পথে দর্শন পাইবেন না।

লোকে বলে "দাঁত থাকিতে দাঁতের বেদন জানেনা।" অভাব হইলে তাহার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়। যে রাজা এক সময়ে আপনার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যসত্তে রাজ্যান্তরের কামনা করিয়া থাকেন, তিনি যখন শত্রু কর্তৃক পরাভূত হন, তখন সেই শত্রু রাজা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অতি অল্প মাত্র রাজ্য প্রদান করিলেও, তখন তিনি তাহা বহু বলিয়া মনে করেন। সেই রূপ মৃত্যু আমার জীবনের অভাব ঘটাইবে, মানবগণ পূর্ব্বে ইহা জানিয়া অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে মন সমর্পণ করিয়া থাকে। অতএব মৃত্যু আমাদিগকে পাপ হইতে নিবর্ত্তিত ও সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে সন্দেহ নাই। আর অনেক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর লোক অনেক সময়ে জীবের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, মৃত্যু তাহাদিগকে আশু সংহার না করিলে, জীব রক্ষা ভার হইত। অতএব মৃত্যু পৃথিবীর মঙ্গলকর পদার্থ। অথবা পরম মঙ্গলালয় দয়ার আধার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু আদি আপাতত দুঃখ দায়ক যে সকল

বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিণামে তাহাই পরম মঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে।

কেহই অমর নহে, সকলকেই মৃত্যুর বশবর্ত্তি হইতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্তাঃ
সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি
যো ভবেদজরামরঃ॥

এই অখিল ত্রৈলোক্য মধ্যে ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত চরাচর লোকের মধ্যে কাহাকেও এমত দৃষ্ট হয় না যে, সে ব্যক্তি অজর ও অমর। অতএব জ্ঞানিগণ, দারা পুত্রাদির মৃত্যুতে [illegible] দ্বারা অভিভূত হইবেন না। এবং আপনার মৃত্যু [illegible] প ভাবিয়া [illegible] প্রতি, ইষ্ট দেবতার প্রতি মন [illegible]

মৃত্যুকালে জীবগণের অশেষবিধ যাতনা [illegible] ষদ্বিবরণ আমরা পরিশিষ্টে বিবৃত করিয়াছি। [illegible] মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে [illegible] বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

পুষ্পরথে ধর্ম্মাত্মার আগমন

ধর্ম্মাত্মার বিষ্ণু দর্শন
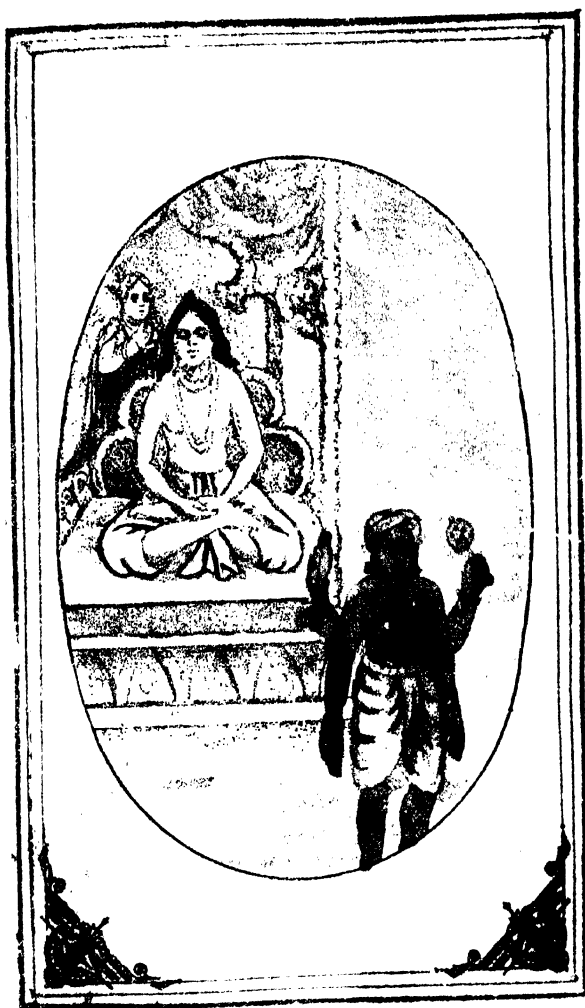
ধার্ম্মিক পুণ্য শীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার জীবাত্মা সৌম্যমূর্ত্তি চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক নীত হন। বিষ্ণুদূতগণ সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে সমুজ্জ্বল ও সুগন্ধময় পুষ্পক বিমানে আরোহণ করাইয়া পুণ্যাত্মার প্রশ্ন অনুসারে বিষ্ণু মাহাত্ম্য শুনাইতে শুনাইতে বিদ্যাধরিদিগের দ্বারা বীজন করাইতে করাইতে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত করেন। দেব দেব পুরুষোত্তম চতুর্ভুজ বিষ্ণু সেই সাধু ব্যক্তি দর্শন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করেন এবং পরম শোভাময় পবিত্র ও সুখ এবং আনন্দময় অনশ্বর রাজ্যের মনোহর প্রাসাদে সংস্থাপন ও বিবিধ অক্ষয় দেব দুর্ল্লভ উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে কহিতে থাকেন, পুণ্যবন্! সাধো! আপনার আগমনে এই বৈকুণ্ঠ পুরী পবিত্র ও ধন্য হইল এবং আমিও কৃতার্থ হইলাম। তখন সাধু পুরুষ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং সকম্প পুলকাশ্রুপাত পুরঃসর গদ্গদ স্বরে বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব স্তুতি করেন। অনন্তর তিনি কামচর হইয়া দ্যুলোক, গোলোক, ধ্রুবলোকাদি স্থানে পরম সুখে বিচরণ করিতে থাকেন।

মৃত্যুর সময়ে কোন কোন পাপী যমদূতের ঘোর

দর্শন অপূর্ব্ব বিকট মূর্ত্তি অবলোকনে ভয়ে পুরীষ মূত্র পরিত্যাগ করে। কোন কোন পাপীর বা দাঁতকপাটী লাগে। ২৪ পরগণার জজ আদালতের উকিল পরেশ বাবু সুস্থ শরীরে বেলা ৯ টার সময় পাইখানায় গিয়া যম-দূত দর্শনে ভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই প্রাণ-ত্যাগ করেন। কোন পাপীর মৃত্যুকালে মুখ হইতে বিষ্ঠা উঠিতেও দেখা গিয়াছে। যমদূতগণ কাহাকে কেশে আকর্ষণ করিয়া, কাহাকেও বা বন্ধন করিয়া যমপুরে লইয়া যায়। তথায় রৌরব কুম্ভীপাক, তামসান্ধকার করন্ত বালুকা প্রভৃতি নরক মধ্যে নিপাতিত করিয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। তখন পাপীগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। এই রূপে তথায় বহুকাল যন্ত্রণা ভোগের পর পরিশেষে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

যমদূতগণের ভ্রান্তি বশতঃ এক এক সময়ে অতিশয় অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। ঘোষ পাড়ার নিক-টস্থ এক পল্লী গ্রামে সহচরী নাম্নী দুইটি স্ত্রীলোক বাস করিত, এক সহচরীর শ্বাসের ব্যাধি ছিল, সে মুমূর্ষ প্রায়, অপর সহচরীর শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট; সে কাপড় আছাড় দিতে-

যমদূত কর্তৃক পাপাত্মার যমালয়ে নীত

ছিল, এমত সময়ে শ্বাস রোধ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার বান্ধবেরা তাহাকে দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া গেল। তখন সহচরী জীবিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বাটীতে গমন করিল। তখনি শুনা গেল যে শ্বাস রোগিনী সহচরীর সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যমদূতগণ ভ্রম বশতঃ এক সহচরীকে লইতে আসিয়া অপর সহ-চরীকে লইয়া গিয়াছিল। যমরাজ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইল, যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেই কালগ্রাসে পতিত হইল।

উদ্বন্ধনাদি অপঘাত দ্বারা যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহা-রাই ভূত ও পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গয়ায় বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান হইলে, তাহারা ঐ সকল যোনি হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গোকর্ণ ও মুচুকুন্দ নামক দুই সহোদর ছিল। মুচুকুন্দের অপঘাতে মৃত্যু হইলে, সে ভূত যোনি প্রাপ্ত হইয়া সহো-দরের উপর বড়ই অত্যাচার করিতে লাগিল। সহোদর গয়ায় পিণ্ডদান করিল, কিন্তু তাহাতেও সে ভূত উদ্ধার পাইল না। তাহাতে গোকর্ণ সাধু উপদেশ অনুসারে

তাহাকে ভাগবত পারায়ণ শ্রবণ করাইলে, সে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল।

যে সকল ভূতের পক্ষে গয়ায় পিণ্ডদান বা ভাগবত পুরাণ শ্রবণ সুযোগ না ঘটে, কালক্রমে তাঁহারাও কর্ম্ম ফলভোগাবসানে উদ্ধার হইয়া থাকে। ভূতের দেহ জ্বালাদায়ী কীটে পরিপূর্ণ, তাহারা অন্ধকার ভালবাসে, আলোক সহ্য করিতে পারে না। ভগবন্নাম শ্রবণে তাহাদের বড়ই সুখবোধ হইয়া থাকে এবং আগ্রহ পূর্ব্বক বার বার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে করিতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। শোক বিজয় গ্রন্থোক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভূতের বিবরণেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাপস্বভাব মানুষে যেমন পাপ ভালবাসে, ভূতে তেমন পাপ ভাল বাসে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক্ষণকার ন্যায় মহাপাপ সকল ছিল না, তজ্জন্য তখন এ দেশে ভূতগণ বাস করিত, যে দিন হইতে দেশে পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই দিন হইতে ভূতও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

তখন সচরাচর শ্মশান ভূমিতে ভূত প্রেত বাস করিত, এখন পাপ প্রাবল্যে তথায়ও ভূত থাকে না।

শ্মশান

পাঠক! এখানে শ্মশানের বিভীষিকাময় একখানি চিত্রপট দৃষ্টিপাত করুন। যে দেহ গৌরবে আমরা ধরাকে সরা হেন দর্শন করিয়াছি, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গুরুজনকে এবং বিজ্ঞ প্রাচীনগণকে অবজ্ঞা করিয়াছি, ক্রোধে অন্ধ হইয়া কত লোককে প্রহার করিয়াছি, কত লোকের অপমান করিয়াছি, কত লোককে কটু কাটব্য বলিয়া মর্ম্মাহত করিয়াছি, সেই দেহের এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম দৃষ্টি করিলে, কাহার না বিবেক বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে! চিতানলে দগ্ধ হইয়া, সেই অঙ্গ এখন কেমন কুৎসিতাকার ধারণ করিয়া, পূতিগন্ধি বিস্তার করিতেছে! মাংসহীন কঙ্কাল সার হইতেছে! রক্ত মাংসাশী শৃগাল কুক্কুর ও কাক শকুনি আদি শবের চতুর্দ্দিকে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আজীবন সাধু ভাবে কাল কর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

জীবগণ কর্ম্ম বশেই জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দুই প্রকার, পাপ ও পুণ্য; পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে নরক এবং পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, কর্ম্ম শেষ না

হইলে, জীবগণের মুক্তি লাভ হয় না। পুণ্য করিলেও পুণ্যের ফল ভোগান্তে এবং পাপ করিলেও পাপের ফল ভোগান্তে এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই জীবগণ একবার জন্ম ও মৃত্যু, আবার জন্ম ও মৃত্যু এইরূপ ক্রমে কালচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে। এক বার মুক্তি লাভ করিতে পারিলে আর জন্ম জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ সঙ্কুল এই সংসার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ মুক্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

প্রকৃত ভক্ত লোকেরা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না, যাহাতে তাঁহাদের আর ভবে জন্ম না হয়, এরূপ ইচ্ছাও করেন না। তাঁহারা কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রতিই নির্ভর করিয়া থাকেন এবং কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ভগবদ্দাস্য কেন, নারদের ন্যায় তাঁহার দাসানুদাসেরও দাসত্ব কামনা করেন।

পরিশিষ্ট

যখন মায়া মোহে আকৃষ্ট হইয়া মঙ্গলময় মুক্তির পথ ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্ম-কান্তারে প্রবেশ করে, তখন কঠোরতর কষ্ট সঙ্কটে পতিত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ ও বিবিধ তাপ অনুভব করিয়া থাকে। এই তাপ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ আবার শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই প্রকার। শিরোরোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শ, শ্বাস, শোথ, সর্দ্দি, নেত্ররোগ, অতিসার, কুষ্ঠ, বাত, জলোদর, গ্রহিণী প্রভৃতি নানাপ্রকার শরীর সন্তাপ জনক রোগকে শারীরিক তাপ কহে। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নানা কারণে মানসিক তাপ ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, সরীসৃপ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার প্রাণিগণ হইতে

আধিভৌতিক তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে যে তাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে আধিদৈবিক তাপ বলে। উপরোক্ত তাপত্রয় গর্ভ জনিত ক্লেশ, জরা জনিত ক্লেশ, মৃত্যু-জনিত ক্লেশ, নরক জনিত ক্লেশ ইত্যাদি ভেদে নানারূপে বিভক্ত হয়।

অহো! ঈশ্বরবিমুখ জীবগণের দুঃখের অবধি নাই। সুকুমার শরীর প্রাণিগণ বহুতর মল সংযুক্ত জরায়ু বেষ্টিত গর্ভে এরূপে অবস্থিতি করে যে তাহাদের পৃষ্ঠ, গ্রীবা, অস্থি প্রভৃতি ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র হইয়া থাকে, তাহাতে গর্ভস্থ জীব যাতনা প্রাপ্ত হয়; আবার মাতা যদি গর্ভাবস্থায় অম্ল, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ প্রভৃতি ক্লেশদায়ক বস্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে গর্ভস্থ বালকের ক্লেশ হয়। গর্ভস্থিত শিশুগণ আপনার অঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহারা বিষ্ঠা মূত্র রূপ মহাপঙ্কে শয়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সততই পীড়া পাইতে থাকে; তখন তাহাদের চৈতন্য থাকে কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না। হায়! তখন জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম বশে অতিশয় দুঃখে গর্ভ-

কারায় অবস্থিত হইয়া শতজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে থাকে। জীব যখন পুরীষ, মূত্র, শোণিত শুক্র প্রভৃতি দ্বারা লিপ্তগাত্র হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, তখন গর্ভ সংকোচক বায়ু দ্বারা অস্থি বন্ধন সমুদয় নিপীড়িত হওয়াতে অতিশয় ক্লেশ পাইয়া থাকে, এবং অধোমুখ হইয়া মাতৃজঠর হইতে অতিক্লেশে নিষ্ক্রান্ত হয়। যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন বাহ্যবায়ু স্পর্শে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া জ্ঞান হীন ও স্মৃতিশক্তি বিহীন হইয়া পড়ে।

জীব যখন দুর্গন্ধময় ব্রণতুল্য পদার্থ হইতে ক্রিমির ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়, তখন তাহার বোধ হয় যেন অস্ত্র দ্বারা শরীর খণ্ড খণ্ড হইতেছে, এবং করাত দ্বারা শরীর যেন বিদারিত হইয়া যাইতেছে। তখন নিজ দেহ কণ্ডূয়ন করিতেও সমর্থ হয় না, এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেও পারে না। পরের ইচ্ছানুসারে স্তন্যাদি রূপ আহার প্রাপ্ত হয়। কীট, দংশাদি দংশন করিলেও তাহাদিগকে নিবারণ করিতেও সমর্থ হয় না। এইরূপে একজন্মের পর জন্মান্তর গ্রহণ কালে এইরূপ বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়াই এমত অজ্ঞান হইয়া পড়ে যে আমি কে? কোথা হইতে

আসিলাম, কোথায় আছি কোথায় যাইব? কি করিব? এই সকলের কিছুই জানিতে পারে না। এইরূপে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মবশে পশুসদৃশ মূঢ় এবং ইন্দ্রিয় ও উদর পরায়ণ হইয়া অজ্ঞান জনিত মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

মানবগণ যখন বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগের সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়। জরারোগে শরীর জর্জ্জরীভূত হয়, দন্ত সকল শীর্ণ ও বিগলিত হইতে থাকে। শরীরে ত্বকের তরঙ্গের সহিত দুঃখের তরঙ্গ উপস্থিত হয়। শরীরের স্নায়ু ও শিরা সকল শিথিল হইয়া উঠিয়া পড়ে, চক্ষু এরূপ তেজোহীন হয়, যে, ক্ষুদ্র বস্তু সকল কিছুই দেখিতে পায় না, স্থূল বস্তুও অস্পষ্ট রূপে দর্শন করে। চক্ষু কোটর গত ও তারা নিম্ন গত হয়, নাসা বিবর হইতে লোম পুঞ্জ বাহির হইয়া পড়ে। শরীর সর্ব্বদাই কম্পিত হইতে থাকে। অস্থি সমুদায় প্রকটিত হয়, পৃষ্ঠাস্থির সমস্ত সন্ধিস্থল বক্র ভাব ধারণ করে। বৃদ্ধাবস্থায় জঠরাগ্নি বিধ্বস্ত হওয়াতে যথোপযুক্ত আহার করিতে, আহারীয় বস্তু জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না, সমস্ত কার্য্যে অসমর্থ হয়, এমন কি গমন, উত্থান,

শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কার্য্য করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। বৃদ্ধগণের শ্রবণ শক্তি ও দর্শনশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহাদের মুখ হইতে লালা নির্গত হয়। বৃদ্ধগণ সর্ব্বদাই অপরিষ্কৃত ও অশুচি থাকে। তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ আয়ত্ত থাকে না। তাহারা মৃত্যুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছে শুনিয়াছে বা বলিয়াছে তাহাও 'তাহাদের স্মরণ থাকে না। একটী মাত্র কথা কহিতেও শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্বাস ও কাসাদি দ্বারা মহা আয়াস বোধ হওয়াতে রাত্রিকালে তাহাদের নিদ্রা হয় না। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি উঠাইয়া এবং বসাইয়া দেয়। আপনার পুত্র, স্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই বৃদ্ধের প্রতি অবমাননা করিয়া থাকে। তাহারা শৌচ কার্য্যের অনুষ্ঠানেও সমর্থ হয় না! আহার বিহারে স্পৃহা করে, কিন্তু তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের পূর্ব্ব বান্ধবাদি নিঃশেষিত হয়, পরিবারবর্গও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। বৃদ্ধগণ জন্মান্তর অনুভূত বিষয়ের ন্যায় যৌবনের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

থাকে। মনুষ্যগণ বার্দ্ধক্য অবস্থায় এইরূপ নানাবিধ ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিয়া মরণকালে যে সমুদয় কষ্ট অনুভব করে এক্ষণে তাহার বিবরণ কথিত হইতেছে।

মরণ কালে প্রাণীগণের গ্রীবা, পদ প্রভৃতি অঙ্গ সমুদয় শ্লথ হইয়া যায় এবং ভয়ঙ্কর কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। কখনও অল্পমাত্র জ্ঞানের উদয় হয়, কখনও [illegible] শারীরিক গ্লানি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। আমার [illegible] মার ধান্য, আমার তনয়, আমার ভার্য্যা, আমার [illegible] হ এই সমুদায়ের গতি কি হইবে, এই [illegible] হইয়া যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া [illegible] শরসমূহের [illegible] ন্যায় উগ্র [illegible] বন্ধন সমুদয় ছিন্ন হইতে থাকে। চক্ষু [illegible] হইয়া যায়। তাহারা পুনঃ পুনঃ হস্ত পাদ বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। তালু ওষ্ঠস্থল শুষ্ক হইয়া যায়। কণ্ঠদেশ হইতে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। তৎকালে শ্লেষ্মাদি দ্বারা মানব গণের কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। উদান বায়ুদ্বারা শরীর পীড়িত হইতে থাকে। তখন তাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদিদ্বারা অতিশয় কাতর এবং বিবিধ প্রকার

পাপীর যন্ত্রণা

মহাতাপে অভিভূত হইতে থাকে; তদনন্তর মহাক্লেশে যখন প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়, তখন যমকিঙ্করগণ তাহার উপর বিলক্ষণ নিপীড়ন করিতে থাকে। তৎপরে অনেক যন্ত্রণা ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ করে। মানব গণ জন্ম ও মৃত্যু সময়ে এইসকল এবং অন্যান্য অতিশয় উগ্রতর দুঃখভোগ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর তাহারা নরক গামী হইয়া যে সমস্ত দুঃখ ভোগ করে তাহার বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

যমের কিঙ্কর গণ ত্যক্তদেহ প্রাণীর আত্মাকে প্রথমে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে দণ্ডদ্বারা তাড়না করে। তদনন্তর তাহারে যমপুরে লইয়া গিয়া নরক মধ্যে অত্যুষ্ণ বালুকা রাশিতে, বহ্নিযন্ত্রে নিক্ষেপ ইত্যাদি অতিশয় ভয়ঙ্কর কার্য্য দ্বারা যে অত্যন্ত দুঃসহ যাতনা প্রদান করে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। কোন কোন পাপীকে করাতদিয়া চিরিতেছে, কাহাকেও বা লবণময় ভূমির উপর ঘর্ষণ করিতেছে কাহাকে কুঠার দ্বারা ছেদন এবং কাহাকে ভূমির মধ্যে পুতিয়া ফেলিতেছে, কাহাকেওবা শূলে রোপিত করিতেছে। কোন কোন পাপীকে ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ ও কাহাকেও তপ্ত তৈলে

তর্জ্জিত করিতেছে। গৃধ্রগণ কাহারও মাংস ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতেছে এবং কাহাকেও বা ব্যাঘ্রগণ চর্ব্বণ করিতেছে। কোন কোন পাপীকে উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়া দিতেছে, কাহাকেও বা নিদারুণ যাতনাদায়ক যন্ত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। পাপীগণ পাপকার্য্য নিবন্ধন যে সমস্ত যাতনা ভোগ করে; তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

হায়! মানবগণ এইরূপ যাতনা ভোগের পর একেবারেই পরিত্রাণ পায়না, নরক ভোগের পর পুনর্ব্বার গর্ভস্থ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ জন্ম মাত্র, কেহ কেহ বাল্যকালে, কেহ কেহ যৌবন কালে, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায়, কেহ কেহ বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার নহে। কার্পাস বীজ সকল যেমন তন্তু সমূহ দ্বারা আবৃত থাকে, জীবগণও সেইরূপ যতকাল জীবন ধারণ করে ততকাল নানাবিধ দুঃখ তন্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে থাকে। ধনের উপার্জ্জন কালে, তাহা রক্ষাকালে, নাশকালে এবং প্রিয়জন ও প্রিয়পদার্থের বিয়োগকালে মনুষ্যগণের অশেষ প্রকার দুঃখ উপস্থিত

হয়। এই সংসার মধ্যে যে যে বস্তু মানবের প্রীতিদায়ক, সেই সেই বস্তুই দুঃখ স্বরূপ মহাবৃক্ষের বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন প্রভৃতি বস্তু দ্বারা মানবের যে পরিমাণে দুঃখ হয়, সে পরিমাণে সুখ হয় না। এইরূপে যাহাদের অন্তঃকরণ সাংসারিক দুঃখ রূপ প্রচণ্ড সূর্য্য দ্বারা পরিতাপিত হইতেছে, তাহাদের পক্ষে মুক্তি রূপ বৃক্ষের সুশীতল ছায়া ব্যতিরেকে আর কোথাও সুখ দৃষ্ট হয় না।

এবিষয়ে দার্শনিক পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে কোন ব্যক্তি দৈববশে বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড রৌদ্রে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিতেছে। তাহার হস্তে ছত্র নাই, পথিমধ্যে শ্রম নিবারক একটিও বৃক্ষ নাই, অৰ্দ্ধপথ গমন করিয়া প্রতপ্ত বালুকার প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত ও অবশ হইয়া উত্তপ্ত বালুকা রাশিতেই পতিত হইল, প্রায় প্রাণ বিয়োগ হয়, এমন সময় এক বৃহৎফণ কালসর্প নিকটে আসিয়া উত্তপ্ত বালুকা পতিত ব্যক্তির মুখমণ্ডলে দংশন করিল, দংশন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে সেই ব্যক্তি কালসর্পের বৃহৎ ফণার ছায়া পাইয়া যেমত সুখী হইল,

সাংসারিক লোক সকলও সেই রূপ সুখী। এই সুখ যে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দ রূপ কৈবল্য সুখ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

তুমি শয়ন করিয়া রহিয়াছ, তোমার নিকটে আর একটী মনুষ্য শুইয়া রহিয়াছে, আমি তোমাদের নিকটে যাইয়া কহিলাম তুমি কে? আর তুমিই বা কে? তুমি কহিলে আমি নরহরি, অন্যব্যক্তি কহিল আমি হরিশ্চন্দ্র, আমি কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার বড় যাতনা হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন তুমি উঠিয়া বসিলে, হরিশ্চন্দ্র আর উঠিতে পারেনা, নড়িতে চড়িতেও পারেনা, তুমি স্বয়ং এখন চলিতে পার, হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং আর চলিতে পারেনা। এখন দেখা যাইতেছে, হরিশ্চন্দ্র অপেক্ষা তোমাতে এমন কোন অধিক পদার্থ আছে, যদ্দারা তুমি চলিতে ও কথাবার্ত্তা

কহিতে পারিতেছ। সেই পদার্থ কি? বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে তাহা চৈতন্য পদার্থ, তাহা আছে বলিয়াই তোমার বুঝিবার ও চলিবার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ হরিশ্চন্দ্রের হস্তপদ চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি সকলই রহিয়াছে, কিন্তু সে কিছু বলিতে পারে না, চলিতেও পারেনা, দর্শন করিতেও পারেনা; শুনিতেও পায় না। তাহার শরীরে চৈতন্য নাই। চৈতন্য শরীর হইতে বিভিন্ন পদার্থ। আবার দেখ তুমি যখন উত্তমরূপ নিদ্রিত রহিয়াছ, তখন তোমাতে চৈতন্য রহিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কিন্তু তোমার জ্ঞান নাই। তখন তোমার কোনও বস্তু হরণ করিয়া লইলে তুমি জানিতেও পারনা, অতএব তোমার চৈতন্যে অন্য কোন পদার্থের সংযোগ আছে, যদ্দ্বারা নিদ্রাভঙ্গের পর তুমি আবার জানিতে, শুনিতে, দেখিতে, বলিতে ও চলিতে এবং সমস্ত কার্য্য করিতে পার; এখন তুমি জানিও যে সেই পদার্থই তুমি অর্থাৎ তোমার জীবাত্মা। তদ্দ্বারাই তোমার তুমিত্ব হইয়াছে। এখন বুঝিতেছ, যে উক্ত মৃত হরিশ্চন্দ্রের জীবাত্মা সেই দেহে আর নাই, তাহা বহির্গত হইয়াছে, হরিশ্চন্দ্রের তুমিত্বও ঘুচিয়া গিয়াছে।

এখন তুমিত্ব বিশিষ্ট জীবাত্মা যে কি? তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি মনোনিবেশ কর।

দেখ তুমি ইচ্ছা করিতে পারিতেছ, ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেছ, শুনিতে পারিতেছ, স্পর্শানুভব করিতে, গন্ধ আঘ্রাণ করিতে এবং রসাস্বাদন করিতেও পারিতেছ, চলিতে, বলিতে, ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতেও পারিতেছ। এই সকল কার্য্য তোমার সমস্ত দেহের কোন্ কোন্ অংশ দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেছ, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শন করিতেছ; আর হস্ত দ্বারা গ্রহণাদি, পাদ দ্বয় দ্বারা গমনাদি, গুহ্য দ্বারা মল ত্যাগাদি, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য কথনাদি নির্ব্বাহ করিতেছ। নেত্রাদি পাঁচটি তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তাদি পাঁচটী তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়। তোমার দেহমধ্যে আরও কি কি আছে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানাযায় যে নাসিকাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসাদি হইতেছে, তাহা বায়ুর কার্য্য। অতএব তোমার দেহে বায়ু রহিয়াছে। বায়ু এক-প্রকার আছে এমত বিবেচনা করিও না। পাঁচ প্রকার বায়ু

তোমার দেহে বিদ্যমান ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, ঊর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমন শীল পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী বায়ুর নাম অপান, সমস্ত নাড়ীতে সঞ্চারণশীল সমস্ত শরীর ব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান, ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থান স্থায়ী বায়ুর নাম উদান, ভুক্ত ও পীত অন্ন জলাদির সমীকরণ কারী বায়ুর নাম সমান। তোমার দেহে মন ও বুদ্ধি নামক পদার্থ দ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে তোমাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই সপ্তদশ পদার্থ পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াই তোমার দেহে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

উপরে যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা কহিয়াছি, তাহা তোমার চক্ষু কর্ণাদিতে নাই, তাহা তোমার জীবাত্মার, সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে। তুমি যখন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন কর, তখন তোমার চক্ষু নিমিলিত থাকিলেও তুমি দেখিতে পাও, এবং কোন বস্তু দর্শনের পর স্মরণ করিলে

মনোমধ্যে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাও; তোমার জীবাত্মার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবস্থানই তাহার কারণ। এক্ষণে জীবাত্মা কাহাকে বলে তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। এই জীবাত্মাই; "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা আমি সুখী আমি দুঃখী" এইরূপ অভিমান বিশিষ্ট, এই জীবাত্মাই ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই গুলি মিলিত হইয়াই জীবাত্মা হয়।

যাহা হউক মুক্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই জীবাত্মাই মায়া দ্বারা অভিভূত এই সংসারে দেহধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ এবং সুখ দুঃখ ও স্বর্গ নরক প্রভৃতি সমস্তই ভোগ করিয়া থাকে। পরমেশ্বরে মন সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিলে জীবাত্মাকে এই ক্লেশসংকুল সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ করা যাইতে পারে।

পরমাত্মা।

পূর্ব্বে কহিয়াছি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, তিনিই জ্ঞানময় পরমেশ্বর। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ; অব্যক্ত স্বরূপ, অজর, অজ, অচিন্ত্য, অব্যয়, নিত্য, বিভু, অনাদি, অক্ষয়, সর্ব্বব্যাপক; তিনিই পরমধাম, তাঁহা হইতেই এই জীব নিবহের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা সেই নিত্যানন্দ, নিত্য মঙ্গলময় তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতে এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই ইহার পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার প্রকৃতি রূপিণী শক্তিকে এই সংসারের সমস্ত কার্য্য সাধনে নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মানবগণ! যদি কল্যাণ কামনা থাকে, তবে সেই মঙ্গলময় সর্ব্ববিভু পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনি ব্যতিরেকে দুঃখ নিবৃত্তি করিবার সামর্থ আর কাহারও নাই। তোমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি কর।

সেই পরম পদার্থ পরমেশ্বর যে কি পদার্থ তাহা কেহই স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিতে পারে না, তবে তিনি যোগিগণের ধ্যান গম্য হইয়া থাকেন, কিন্তু ধ্যান ভঙ্গের পর যোগিগণ সেই অনির্ব্বচনীয় পরম পদার্থ যে কি? তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না, যাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে, এমন বাক্যই নাই। তবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে তাঁহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরমাত্মা কি? এ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকলের বিচার পূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অতিশয় স্থূল বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকে যে পুত্রই আত্মা. তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "আত্মাই পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে" এবং যুক্তি বলিয়া থাকে যে আপনাতে যে প্রকার প্রীতি, পুত্রেও সেইরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়। আরও কহিয়া থাকে যে, পুত্রের পুষ্টি হইলে এবং পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট ও নষ্ট হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব হয়। অতএব পুত্রই আত্মা।

অপর কোনও চার্ব্বাক স্থূল শরীরকে আত্মা কহিয়া

থাকে, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় "এই অন্নরসের বিকার রূপ পুরুষই আত্মা" এবং যুক্তি বলে, পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও দাহ্যমান গৃহ হইতে আপনার বহির্গমন দৃষ্ট হয়, আর অনুভব করে যে "আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি, অতএব স্থূল শরীরই—আত্মা"।

অপর চার্ব্বাক গণ কহিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টিই—আত্মা। তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "সেই ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিয়াছিল" এবং যুক্তি বলে যে, ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর অচল হয় আর এইরূপ অনুভব হয় যে "আমি অন্ধ, আমি বধির" ইত্যাদি। অতএব ইন্দ্রিয়গণই আত্মা।

অন্য চার্ব্বাকগণ কহিয়া থাকে যে প্রাণই আত্মা, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "শরীরাদি হইতে ভিন্ন প্রাণময় আত্মা হয়েন" এবং যুক্তি বলে যে প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার অভাব হয়" আর এইরূপ অনুভব হয় যে "আমি ক্ষুধাযুক্ত, আমি পিপাসা বিশিষ্ট ইত্যাদি"

অপর চার্ব্বাকগণ মনকে আত্মা কহে, ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে ভিন্ন মনোময় অন্তরাত্মা"। এবং যুক্তি বলে যে মন নিস্তব্ধ হইলে

প্রাণি ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয়, আর অনুভব হয় যে, আমি সংকল্পবিশিষ্ট আমি বিকল্প বিশিষ্ট ইত্যাদি

বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বুদ্ধিকে আত্মা কহে, তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা হয়েন এবং যুক্তি কহে যে কর্ত্তার অভাবে করণের অভাব হয়, আর এই অনুভব হয় যে,কর্ত্তার অভাবে করণের শক্তির অভাব হয়, অতএব বুদ্ধিই আত্মা।

তার্কিক পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে অজ্ঞান অর্থাৎ দেহে অবস্থিত মোহাবচ্ছিন্ন প্রকৃতিই আত্মা, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "শরীরাদি হইতে ভিন্ন আনন্দময় আত্মা" তাহাতে এই যুক্তি দেয় যে সুষুপ্তি-কালে অজ্ঞানেতে বুদ্ধি প্রভৃতির লয় দৃষ্ট হয়, আর এই অনুভব হয় যে আমি অজ্ঞ ইত্যাদি। অতএব অজ্ঞানকে আত্মা বলা যায়।

ভট্টমতানুযায়ী পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে আত্মা বলা যায়, তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দিয়া থাকেন যে "প্রজ্ঞান ঘনস্বরূপ আনন্দ ময় আত্মা"। এবং এই যুক্তি দেয় যে সুষুপ্তিকালে সকল

ইন্দ্রিয়াদি লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ অনুভূতহয়, আর এই অনুভব হয় যে আমি আমাকে জানি না।

অন্য বৌদ্ধ গণ কহেন যে,শূন্যই আত্মা, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল এবং এই যুক্তি দেয় যে সুষুপ্তি কালে সকলেরই অভাব হয়। আর এইরূপ অনুভব হয় যে, শয়ন করিয়া সুষুপ্তিকালে আমার অভাব হইয়াছিল, সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এই প্রকারে আপনার অভাব রূপ স্মৃতির অনুভব হয় ইত্যাদি।

এই সকল অতি মূঢ় প্রভৃতি বাদীগণ কর্ত্তৃক উক্ত উত্তরোত্তর শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতি যুক্তি ও অনুভবাদির আত্মা প্রতিপাদনের খণ্ডন হেতু পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত কেহই আত্মা নহে। আরও "প্রত্যেক্ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর স্থূল নহে, ইন্দ্রিয় নহে প্রাণ নহে, মন নহে, কর্ত্তা নহে, তিনি কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, এই প্রবল শ্রুতির বিরোধ হেতু পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সমস্তের মধ্যে কেহই আত্মা নহে।

এক্ষণে পরমাত্মা কি? তাহাই কথিত হইতেছে। পুত্রাদি

শূন্য পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহের অবভাসক অর্থাৎ প্রকাশক, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ, মুক্ত সত্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ চৈতন্যই আত্মা, ইহা বেদান্ত তত্ত্ববিদ্ মহাত্মা পণ্ডিত গণের ও যোগীগণের অনুভব সিদ্ধ।

জীবাত্মা যখন আপনার ইন্দ্রিয়াদি উপাধি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, তখনই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের উপাসনা বিফল হয় না, যেহেতু সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

তদনুসারে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অদ্বিতীয় জ্ঞানকে পরমেশ্বর কহেন, অনন্তাবতার শ্রীযুক্ত রামানুজ স্বামী পরম ধাম বৈকুণ্ঠ বাসী শ্রীভূ লীলাপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকে পরমেশ্বর বলেন। শ্রীরামপরায়ণ অগস্ত্যাদি মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে পরাৎপর পরমেশ্বর কহেন। কুসুমাঞ্জলি কার উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ শিবকে পরমেশ্বর কহেন। এইরূপে কেহ সূর্য্যকে, কেহ গণেশকে, কেহ কালী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিকে, এবং সাংখ্য

ও পাতঞ্জল দার্শনিকগণ পুরুষকে; বৈশেষিক দার্শনিকগণ জ্ঞান গুণকে, মীমাংসা দার্শনিকগণ মন্ত্রকে পরেমেশ্বর বলেন। নৈয়ায়িকগণ যুক্তি সিদ্ধ নিত্য ইচ্ছা নিত্য কৃতি বিশিষ্ট, কর্ম্ম ফলদাতাকে পরমেশ্বর বলেন। নাস্তিকগণ পরমেশ্বর লোকব্যবহার সিদ্ধ এই কথা বলেন। অধিক কি শিল্পকারগণ বিশ্বকর্ম্মাকে পরমেশ্বর বলেন। যেমন ব্রাহ্মণাদি জাতি বাৎস্যাদি গোত্র অসিত দেবলাদি প্রবর ও কুলধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ সর্ব্ববাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর প্রসিদ্ধই আছেন, তাঁহার নিরূপণের আবশ্যক কি আছে?।

হে মানবগণ! তোমরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি কর, তাঁহার উপাসনা কর, তিনি তোমাদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল বিধান করিবেন। তুমি যদি আপনি কিছুই স্থির করিতে না পার, তবে গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনা কর, নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি এবং তদন্তর্গত জাতিস্মরত্বাদি।

পুরাণ মহাভারত ও ইতিহাসাদিতে পাওয়া যায় যে, সত্যবতী ব্যাসদেবকে স্মরণ করিবামাত্র শত সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। পরশু-রাম আকাশ মার্গে আগমন করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌতম ঋষি অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি পাষাণ ময়ী হও, তিনি তৎ-ক্ষণাৎ পাষাণ মূর্ত্তি হইলেন। এই সকল বিষয় সিদ্ধি হইবার কারণ কি? তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারা যায় যে ঐ সকল মহর্ষি-গণ যোগবলে ঐশ্বর্য্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? তাঁহারা সেই সিদ্ধিবলে আকাশ গমনে সমর্থ, পরচিত্ত জ্ঞানে সমর্থ এবং অভিশাপাদি প্রদান করিতে সমর্থ, পুত্রোৎ-পত্তির বর প্রদানে সমর্থ। এক্ষণে আমরাও যদি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই, তবে আমরাও ঐরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া জাতিস্মরত্ব, ভবিষ্যৎ ও অতীত বৃত্তান্ত সমস্তও অব-গত হইতে পারি। কিরূপে তৎসমুদয় লাভ হয় এবং

কিরূপেই বা সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় এক্ষণে তদ্বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করিলে সমস্ত ঐশ্বর্য্যই লাভ হইয়া থাকে। এই সকলের বিবরণ একৈক ক্রমে কথিত হইতেছে।

যম।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরধন হরণ না করা), ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জন) অপরিগ্রহ (সমাধি অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত দ্রব্য মাত্রেরই অসংগ্রহ)। এই পঞ্চবিধ যমের অনুষ্ঠান দ্বারা যে যে ফল লাভ হয় তাহা ক্রমে উক্ত হইতেছে।

অহিংসা, প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

অহিংসা নামক যম সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ মনুষ্যগণের মন সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিশূন্য হইলে হিংস্র জন্তুগণ অহিংস্রক হইয়া তাহার নিকট বৈরভাব পরিত্যাগ করে।

সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।

সত্য নামক যম সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিলে যে কোনও ক্রিয়ার ফল সেই মানবের অধীন হইবে অর্থাৎ তাহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে। এই সিদ্ধি দ্বারা মহর্ষিগণ অভিশাপ প্রদান করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ দৃঢ়ীভূত হইলে রত্ন সকল আপনা হইতেই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সমস্ত রত্ন লাভ জনিত তৃপ্তি লাভ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য লাভঃ।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজ চিত্তে এবম্বিধ সামর্থ্যের উৎপত্তি হয় যে তাহার বল সর্ব্বত্রই অব্যাহত হয়। তাঁহার উপদেশ অথবা কার্য্য সর্ব্বত্রই সফল

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্ম কথন্তা সংবোধঃ

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে মনুষ্যগণ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্ম বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারে। ইহাই এক প্রকার জাতিস্মরতা।

নিয়ম।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ একান্তরূপে মন সমর্পণ। এই পঞ্চবিধ নিয়ম সিদ্ধ হইলে যে যে সিদ্ধিলাভ হয়, সেই সেই বিষয় ক্রমে কথিত হইতেছে।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সাপরৈরসংসর্গশ্চ।

বাহ্য শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে শরীরের প্রতি তুচ্ছতা জ্ঞান, এবং পর সঙ্গের ইচ্ছারও পরিত্যাগ হয়। তখন জল বুদ্ বুদ্ তুল্য ক্ষণধ্বংসী মল মূত্রাদির আধার, অন্নের বিকার মাত্র এই দেহের প্রতি একান্ত অনাস্থা জন্মে, আর পর শরীর সংসর্গেরও ইচ্ছা দূরীভূত হয়, তখন উপাসক বিনা প্রতিবন্ধকে যোগ সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

আভ্যন্তর শৌচ সিদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে প্রথমে

সত্ত্ব শুদ্ধি পরে সৌম্য অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা, সর্ব্বতোভাবে চিত্তের তৃপ্তি, তদনন্তর একাগ্রতা, তৎপরে ইন্দ্রিয় জয় এবং তদনন্তর আত্ম দর্শনের সামর্থ জন্মে।

সন্তোষাদুত্তমঃ সুখলাভঃ।

সন্তোষ সুসিদ্ধ হইলে মানবগণ এক প্রকার অনুপম সুখ লাভ করেন, এই সুখ ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই সুখের ন্যূনাধিক্য নাই। অর্থাৎ ইহা পূর্ণ সুখ।

কায়েন্দ্রিয় সিদ্ধিরশুদ্ধি ক্ষয়াৎ তপসঃ।

তপঃ সিদ্ধি হইলে দেহের ও মনের অশুদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের আবরণ অথবা প্রতিবন্ধকতা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন যোগিগণ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছারূপে আপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছাক্রমে অণুতুল্য অথবা বৃহৎ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মতম পদার্থে এবং দূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থকেন।

স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ।

স্বাধ্যায় সুসিদ্ধ হইলে ইষ্টদেবতার সন্দর্শন হয় এবং বিবিধ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।

সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ।

ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত সমাবেশ পরিপক্ক হইলে অন্য কোন সাধন (আসনাদি) না করিলেও উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বলেই তাঁহার আত্মক্লেশ বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি তদ্দ্বারাই সমস্ত যোগ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

আসন সিদ্ধি হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির দ্বারা অভিঘাত অর্থাৎ পীড়া প্রাপ্ত হয় না। তখন শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি বাত্যা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি সমস্তই সহ্য হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে প্রকাশের অর্থাৎ মনে সর্ব্ব ব্যাপকতা ও প্রকাশকতার আবরণ অর্থাৎ আচ্ছাদক অবিদ্যাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, আর ইহা দ্বারা ধারণা শক্তি জন্মে।

প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণ উত্তম রূপে আত্ম-বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে যথেচ্ছ নিয়োগ করিতে পারা যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণ রূপ গন্ধাদি দ্বারা আর আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত কর যাইতে পারে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ ফলক মানসা ক্রিয়ার একত্র প্রয়োগের নাম সংযম। এই সংযমের দ্বারা বহুতর অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ইহা সুসিদ্ধ হইলে মানবগণ অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা শালী হইয়া উঠেন। তাহার বিবরণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধ হইলে প্রজ্ঞা নামক অতি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বৃত্তির আলোক লাভ করিতে পারা যায়। এই সংযম সিদ্ধ হইলে মানবগণের সংকল্প অথবা ইচ্ছা প্রয়োগ অব্যর্থ হয়, তখন তাঁহার যাহা ইচ্ছা সংযম প্রয়োগ করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারেন।

পরিণামত্রয় সংযমাদতীতানাগত জ্ঞানম্।

বস্তুর পরিণাম অর্থাৎ কালিক সম্বন্ধ গত অবস্থা

তিন প্রকার, যথা—মৃত্তিকার পরমাণু (১), তাহা হইতে কপাল (২), তাহা হইতে ঘট—(৩)। বস্তুর এই ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি সংযম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি একত্র প্রয়োগ করিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

শব্দ অর্থ ও শব্দ শ্রবণ জনিত প্রত্যয় এই তিনের অধ্যাস অর্থাৎ সজাতীয়ের প্রতি বিজাতীয়ের আরোপ বা সংসর্গ হইলে তাহাকে সঙ্কর বলে, তাহাদের এক এক বিভাগের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার পশু পক্ষি প্রভৃতি জন্তু দিগের বাক্য জ্ঞান হয়।

চিত্তগত কর্ম্ম সংস্কার সকল পাপ পুণ্য। সংযম প্রয়োগ দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল জানিতে পারা যায়। ইহা এক প্রকার জাতি স্মরত্ব।

ফলতঃ যোগবলে জাতি স্মরত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে মহর্ষি জৈগীষব্য আত্মনিষ্ঠ সংস্কার (আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম) সাক্ষাৎ করিয়া দশকল্পের জন্ম বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক ভূতের স্থূল স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়িত্ব ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ অবস্থা বিশেষে সংযম প্রয়োগ করিলে ভূত জয় অর্থাৎ মহাভূত সকল বশীভূত হইয়া থাকে। এই ভূতজয় সিদ্ধ হইলেই অণিমাদি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অণিমাদি সিদ্ধি আট প্রকার, যথা—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিতা বশিতা চৈব তথা কামাবসায়িতা॥

অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, ও কামাবসায়িতা সিদ্ধি এই অষ্ট প্রকার। ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি লাভ হইলে ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইতে পারে। ইহার বিবরণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাব। এই অণিমাসিদ্ধি প্রভাবে দেবতাগণ ও সিদ্ধগণ সূক্ষ্ম হইয়া সর্ব্বত্রই বিচরণ করেন। তখন তাঁহাদিগকে কেহই দেখিতে পায় না। অণিমা সিদ্ধ হইলে শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে এবং বদ্ধ গৃহাদির অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ হওয়া যায়।

লঘিমা—অর্থাৎ লঘুর ভাব। লঘিমা সিদ্ধির প্রভাবে

সূর্য্য-রশ্মি অবলম্বন করিয়া, সূর্য্যলোকে গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। এই সিদ্ধি দ্বারাই বৃক্ষস্থিত পত্রোপরি দণ্ডায়মান হইয়া স্থির থাকিতে এবং কাষ্ঠ পাদুকা (খড়ম পায়ে দিয়া জলের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে পারা যায়।

প্রাপ্তি—অর্থাৎ দূরস্থিত পদার্থের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, ইহার প্রভাবে গৃহে বসিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্র-কেও স্পর্শ করিতে পারা যায়।

প্রাকাম্য—অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত। প্রাকাম্য সিদ্ধির প্রভাবে ইচ্ছানুসারে ভূমিতে প্রবেশ ও ভূমি বিদা-রণ পূর্ব্বক উত্থিত এবং জলে মগ্ন হইয়া তাহার মধ্যে ইচ্ছামত সময় ব্যাপিয়া অবস্থিত হইতে সমর্থ হওয়া যায়।

মহিমা—অর্থাৎ মহত্তের ভাব। মহিমা সিদ্ধির দ্বার মহা প্রভাবশালী হইতে পারা যায় এবং নিজ শরীরা যথেষ্টরূপে বর্দ্ধিত করিবার সামর্থ্য জন্মে।

ঈশিত্ব—অর্থাৎ প্রভুত্ব। ঈশিত্ব সিদ্ধির দ্বারা ভূত ভৌতিকাদির উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

বশিত্ব—অর্থাৎ বশ্যতা। বশিত্ব সিদ্ধি দ্বারা ভূত ভৌতিক পদার্থ সমূহ ইচ্ছা করিলেই বশীভূত হয়।

কামাবসায়িতা—অর্থাৎ সত্য সঙ্কল্পতা। এই সিদ্ধি দ্বারা যেরূপ মনে করা যায়, ভূতগণ সেই রূপই হইয়া থাকে।

চিদ্বস্তুর জীব দেহে প্রবেশ বিবরণ।

"পরমাত্মাদ্বয়ানন্দ পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশদ্ জীব রূপতঃ॥"

এই জগৎ উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। তিনি স্বয়ং ইচ্ছা মাত্রে মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সামান্যতঃ জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে উত্তম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং দেবতা হইয়াছেন এবং মানবাদির অধম শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক মোহ বশতঃ আবার দেবতাদিগের উপাসক রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

অনেক জন্ম জন্মান্ত পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া পরে মনুষ্যগণ আত্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়, পশ্চাৎ তত্ত্ব বিচার দ্বারা মহা মোহ বিনষ্ট হইলে, উপাধি বিনাশ সহ-

কারে পুনর্ব্বার স্বয়ং নিত্য শুদ্ধ রূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন।

অদ্বিতীয় আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে দ্বিতীয়ত্ব ও দুঃখিত্ব রূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম বন্ধ, আর ঐ পরমাত্মাতে যথার্থ স্বরূপে যে অবস্থিতি তাহার নাম মোক্ষ।

অবিচার জনিত সেই বন্ধ, বিচার দ্বারা বিনষ্ট হয়, অতএব জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের ভেদাভেদ বিষয়ে সর্ব্বদাই বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

যেমন নৃত্যশালা স্থিত দীপ জ্যোতি, গৃহস্বামী, সভ্যগণ ও নর্ত্তকী এই সকলকেই সমান ভাবে এককালে প্রকাশিত করে এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে, সেই রূপ শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ এই সমুদায় এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিষয় সকল ইহারা সাক্ষি চৈতন্যের জ্যোতিতে এককালে সমান ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান থাকে।

কূটস্থ চৈতন্য জ্যোতি নিরন্তর প্রকাশিত হইয়া জ্ঞানরূপ এই বুদ্ধি নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে থাকে। তাহার বিশেষ এই যে অহঙ্কার গৃহস্বামী স্বরূপ,

ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল সভ্য স্বরূপ, বুদ্ধি নর্ত্তকী স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সকল বাদ্যকর স্বরূপ এবং সাক্ষী চৈতন্য দীপ জ্যোতি স্বরূপ, এতদ্রূপ রঙ্গ স্থলে বুদ্ধির নৃত্যই উপযুক্ত। যেমন রঙ্গশালাস্থিত দীপ একস্থানে থাকিয়াও সেই গৃহের সর্ব্বত্র সমানরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াও এককালে অন্তর্বাহ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অতএব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর আপন ইচ্ছা বশে এই সংসার মধ্যে এবং জীবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই রূপে লীলা করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ মানবগণ স্বীয় বুদ্ধি বলে যোগসাধন ও সেই পরমাত্মার উপাসনা ও মোক্ষ লাভ করিয়া নিরন্তর নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিলে, হয়ত তুমি মনে করিবে যে, এ একটা বন মানুষের ন্যায় অসভ্য জ্ঞান-বর্জ্জিত মূর্খতম মানুষ বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তুমিই আবার মনে

জীবন মুক্ত

করিবে, এই অলৌকিক মহাত্মা পুরুষই ধন্য, ইনি এই ভুবনতল পবিত্র করিয়া রহিয়াছেন। আমরা এক্ষণে সেই মহাপুরুষের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যে মহাপুরুষ যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই মহাত্মার অন্তঃকরণে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান বিরাজিত হইলে, অজ্ঞান ও অজ্ঞান জনিত সঞ্চিত পুণ্য, পাপ, সংশয় ও বিপর্য্যাদির একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। তখন তাঁহার সংসার বন্ধনরূপ কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষকে মুক্ত পুরুষ বলা যায়। জীবদ্দশায় মুক্ত হন বলিয়া তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্থিত ভ্রম সকল বিনষ্ট হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং পাপ পুণ্যাদি কর্ম্ম ফল সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়।

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রতকালে অথবা সমাধি রহিত অবস্থায় রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র ব্যাধিময় বীভৎসতর শরীর এবং অন্ধতা, অক্ষমতা, অপটুতা প্রভৃতির আশ্রয় ইন্দ্রিয় সকল, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহাদির আকর স্বরূপ অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানের অবিরোধে পূর্ব্বকৃত প্রারব্ধ (যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে এমত) কর্ম্ম সকল, ভোগ করত এই দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন না, যেমন ইন্দ্রজালিকের কুহকোদভূত ঐন্দ্রজালিক পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই পদার্থ সমস্ত দর্শন করিয়াও সত্য বলিয়া মনে করেন না, তিনিও তদ্রূপ এই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করেন না।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে—

সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব।
সমনা অমনাইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়; অর্থাৎ তাঁহার চক্ষুঃ স্বসংযুক্ত দৃশ্যবস্তু দর্শন করিয়াও বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন না। এইরূপ কর্ণ থাকিতেও

কর্ণ হীন, মন থাকিতেও মনোহীন এবং প্রাণ সত্ত্বেও প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থিতি করেন।

আচার্য্যগণও কহিয়াছেন যে "যিনি জাগ্রতাবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলেও যিনি অদ্বিতীয় দর্শন করেন, বাহ্যকর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে কর্ম্মহীন অর্থাৎ যিনি কেবল পূর্ব্ব সংস্কারের বশে অভ্যস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, অভিমানপূর্ব্বক করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত পুরুষ, তদ্ভিন্ন কেহই জীবন্মুক্ত নহেন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্ব্বে যে আহার বিহারাদি করিতেন, এক্ষণে কেবল তাহারই অনুবৃত্তি হইবে, তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাহা করিবেন না। অতএব তাঁহার অসদাচর-ণের সম্ভাবনা নাই, কেননা তিনি পূর্ব্বে শুভ কর্ম্মের অভ্যাস এবং অশুভ কর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অথবা শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই উদাসীন থাকেন। এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে, "অদ্বৈত তত্ত্ব জ্ঞান হইলে, যদি যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তবে অশুচি ভক্ষণাদি বিষয়ে কুক্কুরাদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রভেদ কি? অর্থাৎ তাঁহার যথেচ্ছাচার ঘটে না। তত্ত্বজ্ঞান

হইলে যাঁহার যথেষ্টাচরণ নিবৃত্তি না পায়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্য ব্যক্তি নহে।

এইরূপ অবস্থাতেও অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন সদ্‌গুণ সকল ও অহিংসাদি সদ্‌গুণ সকল অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ পূর্ব্বের অভ্যাস বশে স্বতঃই উপস্থিত হয়, যত্ন পূর্ব্বক করিতে হয় না। ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

অদ্বেষ্টত্বাদি গুণ সকল অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানীর বিনা যত্নেই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

অধিক আর কি বলিব, সিদ্ধান্ত কথা এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা এই তিন প্রকারে উপস্থিত সুখ দুঃখ রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সকল অভ্যস্তরূপে অনুভব করত অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্মাত্রে স্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইলে, অর্থাৎ ভোগ দ্বারা কর্ম্ম ফল সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার জীবাত্মা প্রত্যক চৈতন্যে লীন হয়, সুতরাং অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সংস্কার সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি পরম কৈবল্যরূপ অর্থাৎ ইতরাদির মিশ্রণ

শূন্য পরম আনন্দ স্বরূপ পরিপূর্ণ অদ্বৈত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ভেদ শূন্য অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন। তিনি সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

শুকদেব, বামদেব ও মহর্ষি নারদ এইরূপ জীবন্মুক্ত ছিলেন।

পুরুষার্থ সাধন।

এই সংসারের অবস্থা সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠিতে পার, যে, তবে কি এই সংসার মধ্যে কিছুই অবলম্বনীয় পদার্থ নাই? আছে! পুরুষার্থ আছে; তাহা সাধন করিতে পারিলে, মনুষ্য, মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারেন। সেই পুরুষার্থ নানা প্রকার, কেহ বা যজ্ঞ, দান, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা, কেহ বা আর্ত্ত পরিত্রাণ দ্বারা- কেহ বা পরের দুঃখ নিবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা পুরুষার্থ সাধন করিয়া থাকেন। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি রূপ পুরুষার্থ হয়, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নহে। যাহা চিরস্থায়ী

তাহাই পরম পুরুষার্থ। এক্ষণে তদ্বিবরণ বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইতেছে।

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত
নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

ইতি সাংখ্য সূত্রম্॥

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম পরম পুরুষার্থ। পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই পুরুষার্থ। আত্মা দুঃখ নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি কারক ধনাদি প্রার্থনা করে, অতএব দুঃখ নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবারক ধনাদি পুরুষার্থ। সামান্যাকারে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে সামান্য পুরুষার্থ কহে। এমতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম অর্থাৎ ভোগ্য বিষয় লাভে যে পুরুষার্থ লাভ হয়, তাহাও সামান্য পুরুষার্থ। কস্মিন্ কালেও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবে না, এরূপ ভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলা যায়। তাহাই আত্যন্তিক বা পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভ দ্বারা দুঃখ

এরূপে নিবৃত্তি হয় যে, আর তাহা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় না, অতএব মোক্ষলাভই পরম পুরুষার্থ।

লৌকিক উপকরণ অর্থাৎ ধনাদি দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, তাহা আবার উৎপন্ন হয়। ধনাদি দ্বারা উপস্থিত দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সেইরূপ দুঃখ বা তৎসদৃশ অন্য দুঃখ উৎপন্ন হয়, অতএব তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, লৌকিক ধনাদি দ্বারা যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা ক্ষণিক, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি নহে। ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও তাহাকে অপুরুষার্থ বলা যায় না যেহেতু পুরুষ তাহাও চায়। আজ ক্ষুধার প্রতীকার করিব কিন্তু কল্য আবার ক্ষুধার উদয় হইবে ইহা ভাবিয়া কে কবে অদ্যতন ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে উদাসীন থাকিয়া খাইতে চাহে না। অতএব দিন দিন ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং ধনাদি দ্বারা তৎসাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি উভয়ই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ফলত চেষ্টা বাসনার বিষয় সমস্তই পুরুষার্থ। সকল সময়ে, সকল স্থানে দুঃখনাশক লৌকিক উপায় থাকেনা, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। যদিও থাকে তথাপি তদ্দ্বারা দুঃখের

আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সেই হেতু ঐ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তি দুঃখ নাশক লৌকিক উপায় সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অন্ন, পান ও বনিতাদি তুচ্ছ উপায় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন। সেই উপায় এই যে বৈরাগ্য ও শান্তিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিজন বন মধ্যে অবস্থান করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। লৌকিক উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার তারতম্য এবং উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কিন্তু সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তির সেরূপ তারতম্যাদি নাই, তজ্জন্য মুক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অনুপম। ফলত অভিজ্ঞ মহাত্মা পুরুষগণ মুক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া, ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তি ও তৎসাধক লৌকিক উপায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্রোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ধনাদি দৃষ্ট উপায় এবং যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া কলাপ জনিত পুণ্যাদি অদৃষ্ট উপায় এ উভয়ই তুল্য। ধনাদি যেমন নাশশীল, ভোগ পুণ্যভোগও সেইরূপ নশ্বর। অতএব শাস্ত্রীয় উপায় সকলের মধ্যে ক্রিয়াদি উপায় সকল কিয়ৎকালের জন্য দুঃখ নিবারণ করে, কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ

নিবৃত্তির কারণ হয় না। শাস্ত্র মোক্ষপথ অবলম্বন করিতে কহিতেছেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন অনেক গুলি বিচারের বিষয় আছে।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা করিযূথের বিনাশ সম্ভাবনীয় নহে, অতএব কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে কি না এইরূপ বিচার করা আবশ্যক। অতএব জীবাত্মার বন্ধন মোচন হইতে পারে কি না এইরূপ বন্ধন স্বাভাবিক কি না? আত্মা যদি স্বীয় স্বভাবেই বদ্ধ হয়, তাহা হইলে মুক্তির নিমিত্ত সাধনের উপদেশ বিফল ও অসম্ভব হয়। যাহার যেরূপ স্বভাব, উপায় দ্বারা তাহার অভাব হয় না। যদি স্বভা-বের অভাব হয়, তবে বস্তুর অভাব হইয়া পড়িবে, অগ্নির উত্তাপ স্বাভাবিক, যদি তাপের অভাব হয়। তবে অগ্নিরও অভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব বিবেচনা করা উচিত যে আত্মা স্বীয় স্বভাব বশে বদ্ধ নহেন। যাহা স্বভাব তাহা অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশশীল নহে, স্বভাব যখন স্বভাবশীল পদার্থ হইতে অপগত হয় না, তখন তাহার বিনাশের নিমিত্ত চেষ্টা করা বিফল। অতএব বিবেচনা হয় যে, আত্মা বদ্ধস্বভাব অর্থাৎ বন্ধনরূপ স্বভাব-

বিশিষ্ট নহেন। যদি তাহাই হয়, তবে আত্মার মুক্তি বিধায়ক শাস্ত্রীয় উপদেশ সকল অপ্রমাণ অর্থাৎ উন্মত্তের প্রলাপ বাক্যের ন্যায় হইয়া যায়।

যদি বল, আত্মার বন্ধন মোচন করা মানবগণের শক্তির বিষয় নহে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, যাহা অশক্য অর্থাৎ যাহা কেহ সাধন করিতে পারে না, সামান্য নীচ ব্যক্তিও তাহার উপদেশ করে না। যদিও করে, তবে তাহা গ্রাহ্য হয় না। অতএব বিবেচনা করা উচিত যে, অখিল জগতের হিতৈষিণী শ্রুতি যখন আত্মার বন্ধন মোচনের উপায় বিধান করিতেছেন, তখন অবশ্যই তাহা শক্তির বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আত্মার বন্ধন মোচন হইতে পারে, ইহা স্থির করিয়া তাহার উপায় অর্থাৎ উপাসনাদি অবলম্বন করা মনুষ্যগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপে আত্মার বন্ধন মোচন করিতে হইলে, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তি পথের পথিক হইতে হইবে।

মোক্ষ ধর্ম্মের বিবরণ।

"মুক্তিমিচ্ছসিরে তাতঃ
বিষয়ান্ বিষবৎত্যজ।"

যদি মুক্তিতে অভিলাষ থাকে তবে বিষয় সকলকে বিষবৎ জানিয়া পরিত্যাগ কর।

জন্ম, জরা ও মৃত্যু সন্তাপময় এই সংসারে বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া যে কত দুঃখ, কত সন্তাপ, কত যাতনা ভোগ করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। এই নিত্য যন্ত্রণা সকল দূরীভূত করিয়া যদি তুমি নিত্যানন্দ অনুভব করিতে পাও, তবে তাহা চাও কি না? অমৃতে আর অরুচি কার? সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করিতে বাসনা করিলে, মোক্ষ পথের পথিক হইতে হইবে। এই পথে তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, প্রিয়া নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, পরিজন নাই, দাস নাই, দাসী নাই; কেবল তুমিই আছ; তুমি যাহা চাহ, তাহাও আছে। এই পথে চলিতে হইলে, ধনাদির আবশ্যক হয় না, মনের দৃঢ়তার আবশ্যক। একমাত্র দৃঢ়তাকে সঙ্গে করিলে,

তোমার নিকট কোনও দস্যু আসিবে না, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রগণও আসিবে না, যদিও কুহকিনী প্রবৃত্তির ঐন্দ্রজালিক মায়ায় কেহ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি নিবৃত্তি রূপ সুদৃঢ় ও সুতীক্ষ্ণ অসি দেখাইলেই সে দূরে পলায়ন করিবে। এইরূপে বৈরাগ্য অসি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে এই মুক্তি পথে গমন করিতে হইবে।

যদি বল আমি বৈরাগ্য অসি গ্রহণ পূর্ব্বক যাইব কোথায়? আমার লক্ষ্যস্থল কি? সেই স্থানে গমন করিয়াই বা কি হইবে? আমি সেই সেই বিষয় তোমার নিকট বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতেছি। তুমি যেখানে গমন করিবে, তাহার নাম মোক্ষ ধাম, সেই স্থানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, কোনও প্রকার দুঃখ নাই, তথায় নিত্যানন্দ বিরাজমান। তথায় যাইয়া তুমি সেই নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল তাহা ভোগ করিতে থাকিবে,তাহার আর নিবৃত্তি হইবে না। যদি বল মোক্ষ ধাম কি? তবে তাহা শ্রবণ কর,যিনি সত্য স্বরূপ, আনন্দ রূপ, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, যিনি নির্ম্মল, নিষ্কল, অব্যয় ও অনন্ত, যিনি এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া সৃজন, পালন

ও সংহরণ করিতেছেন, সেই নির্লিপ্ত শুদ্ধ পরাৎপর পরমাত্মাই মোক্ষ ধাম। সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া, যে ব্যক্তি মোক্ষলাভে সমর্থ হয়,তাহার জন্ম সার্থক,সেই ব্যক্তি পরম পুরুষার্থ লাভ করিল। তাহাকে আর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না, তাহার আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া-গেল। তিনি পরমাত্মময় হইয়া,তদ্রূপেই অনন্তকাল অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই মুক্তি লাভের উপায় বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক যোগসাধন অর্থাৎ পরমাত্মার উপাসনাই মুক্তি লাভের কারণ।

ঈশ্বরের উপাসনা।

ঈশ্বরের উপাসনাই, সংসারকোষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। আমরা এই স্থলেই সেই উপাসনার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

যে মানব মুক্তিলাভের বাসনা করেন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। চিত্তশুদ্ধিলাভ করিতে

হইলে অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে হয়, তদ্দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অষ্টাঙ্গ-যোগের ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে সমাধি সিদ্ধ হইলে সেই পরমপদ স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

অষ্টবিধ যোগাঙ্গ যথা—

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়ঃ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি যোগাঙ্গ এই আট প্রকার।

যমঃ।

(১) তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রাহা যমাঃ। অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরপীড়া বর্জ্জন; সত্য অর্থাৎ যথার্থ ভাষণ; অস্তেয় অর্থাৎ পরধন হরণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া নিষ্পত্তি এই অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জন; অপরিগ্রহ অর্থাৎ সমাধি অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত বস্তুমাত্রেরই অসংগ্রহ।

নিয়ম।

(২) শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ। শৌচ অর্থাৎ মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাব শুদ্ধি দ্বারা আন্তরিক শৌচ; সন্তোষ অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ ও অলাভে অবিষাদ; তপস্যা— অর্থাৎ পরিমিত ভোজনাদি দ্বারা মানসের একাগ্রতা সাধন; অধ্যয়ন অর্থাৎ উপনিষদাদি ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ; এবং ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে একান্ত রূপে মন সমর্পণ।

আসনম্।

(৩) কর চরণাদি সংস্থান বিশেষ লক্ষণানি পদ্ম স্বস্তিকাদীনি আসনানি।

কর চরণাদির সংস্থান বিশেষ উপবেশনকে আসন বলা যায়। এই আসন সকলের নাম পদ্মাসন স্বস্তি- কাসন ইত্যাদি।

প্রাণায়ামঃ।

(৪) রেচক পূরক কুম্ভক লক্ষণাঃ প্রাণানি গ্রহো- পায়া প্রাণায়ামাঃ।

রেচক পূরক কুম্ভকরূপ প্রাণ পবন সংযমন করিবার উপায়কে প্রাণায়াম কহে। বামনাসা পুট দ্বারা বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বহির্নিসারণ অথবা দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক বাম নাসা দ্বারা বহি-র্নিসারণকে রেচক কহে। উক্ত প্রকারে প্রাণ বায়ুর অন্তঃপ্রবেশন করাকে পূরক কহে এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ুর নিরোধকে কুম্ভক কহে। এই বায়ু কুম্ভ মধ্যে জলের ন্যায় নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম কুম্ভক।

প্রত্যাহারঃ।

(৫) ইন্দ্রিয়নাং স্বস্ব বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হইতে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েব সংযম করাকে প্রত্যাহার বলে।

ধারণা।

(৬) অদ্বিতীয় বস্তুনি অন্তরিন্দ্রিয় ধারণং ধারণা। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয়ের অভিনিবেশকে ধারণা কহে।

ধ্যানম্ !

(৭) তত্রাদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুনি বিচ্ছেদ্যাবিচ্ছেদ্য অন্ত-রিন্দ্রিয় বৃত্তি প্রবাহো ধ্যানম্।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুকে বিচ্ছেদাবিচ্ছেদরূপে যে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ তাহার নাম ধ্যান।

সমাধিঃ।

(৮) সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ; সবিকল্পকো নির্ব্বি-কল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি বিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্বিতীয় বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া শ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্। তদা তন্ময় গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভান-বৎ দ্বৈতাজ্ঞানেঽপ্যদ্বৈতং বস্তু ভাষতে।

নির্ব্বিকল্পকস্তু জ্ঞাতৃ জ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া অদ্বি-তীয় বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্ত বৃত্তেরতিতরা মেকীভাবেনাবস্থানম্।

তদাতু জলাকারাকারিত লবণাবভানেন জলমাত্রা বভাসবদদ্বিতীয় বস্ত্বাকারাকারিত। চিত্তবৃত্তিরবভাসেনা-দ্বিতীয় বস্তু মাত্রমেবাবভাসতে।

সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক ও, নির্বিকল্পক।

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্ত বৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক সমাধি কহে। তৎকালে, যেমন মৃত্তিকাময় হস্তিতে হস্তি জ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে সেইরূপ দ্বৈত জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়।

আর জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্ত বৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। তৎকালে, যেমন লবণ মিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জল মাত্র জ্ঞান হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্ত বৃত্তির জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু মাত্র জ্ঞান হয় অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মে চিত্ত বৃত্তি লীন হইলে সুতরাং পৃথক্‌রূপে তাহার জ্ঞান না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মময়ই হয়। তাহাতে মানবগণ কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

উপদেশ, কর্ত্তব্য ও শ্রোতব্য ।

উপদেশ শ্রবণে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, ভ্রম দূরীভূত হয়। যে ব্যক্তি হীন ও মূর্খ, উপদেশ দ্বারা তাহারও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে, এ বিষয়ে আমরা শাস্ত্রীয় উপদেশ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা সকলের উল্লেখ করিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। উপদেশ শ্রবণে অনেকে সদাচারী হইয়াছেন।

এক রাজা কোনও কারণ বশে এক শিশু পুত্রকে বনে দিয়াছিলেন। সে চণ্ডাল কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত হওয়ায়, আপনাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিত। রাজার মৃত্যু হইলে পর মন্ত্রিগণ সেই রাজ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিল এবং কহিল, তুমি চণ্ডাল পুত্র নহ, তুমি রাজপুত্র। তখন সে আপনার প্রকৃত ও জাতি জানিতে পারিয়া, চণ্ডালের আচার পরিত্যাগ করিল। ইহার মর্ম্ম এই যে, উপদেশ নিষ্ফল ও নিরর্থক নহে; অতএব অজ্ঞকে উপদেশ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গ ক্রমে তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইলেও, জ্ঞান জন্মিতে পারে। এক পিশাচ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এক

সময়ে এক আচার্য্য আপন শিষ্যকে অরণ্যে বসিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, এক পিশাচ সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনাকে পিশাচ যোনি হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্ত হইয়াছিল।

উপদেশ বারম্বার দাতব্য এবং বারম্বার শ্রোতব্য। ঋষি শ্বেতকেতু সাতবার শ্রবণের পর তত্বার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুই চার বারে পারে নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কেই জানিত না, কিন্তু উপদেশ প্রাপ্তির পর জানিয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ গর্ভিণী ভার্য্যা গৃহে রাখিয়া দেশান্তর গমন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ কাল পরে গৃহে আগমন করিয়া তাহার ঔরসজাত পুত্রকে চিনিতে পারিল না, পুত্রও পিতাকে চিনিল না। তদনন্তর স্ত্রীর উপদেশ পাইয়া, উভয়ে উভয়কে জানিতে পারিয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুহৃদের উপদেশেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হয়।

জীবগণ ত্যাগ ও বিয়োগ দ্বারা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সুখী ও দুঃখী হয়। এক ব্যক্তি একটী শ্যেন পক্ষীর শাবক পুষিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে, এই শাবককে বৃথা কষ্ট দিই কেন? এই ভাবিয়া সেই ব্যক্তি শ্যেন-

শাবককে ছাড়িয়া দিল। শ্যেন পক্ষী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হইল, কিন্তু পালকের বিচ্ছেদে দুঃখীও হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংসারে কেবল সুখই নাই, অর্থাৎ দুঃখও আছে।

সর্পের নির্ম্মোকের (খোলোসের) ন্যায় স্নেহ করিবে না, তাহা হইলে দুঃখ পাইতে হয়। এক সর্প আপনার খোলোস ত্যাগ করিয়াও,মমতা হেতু তাহা ছাড়িতে পারে নাই। তাহাতে এক অহি-তুণ্ডিক অর্থাৎ সাপুড়ে এই খোলোসের অনুসরণ করিয়া, তাহাকে ধৃত করিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কিছুতেই মমতা করিবে না, এবং বহুকাল উপযোগ করিলেও প্রকৃতিকে (ভোগ্যবস্তুকে) হেয় জ্ঞান করিবে।

ছিন্ন হস্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্ত্তব্য। এক মুনি অন্য মুনির আশ্রমে না বলিয়া ফলমূল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনি তাহাকে চোর বলিয়া অনুযোগ করিলে, তিনি অনুতপ্ত হইয়া, নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিলেন। মুনি তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়া, হস্তচ্ছেদ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে কহিলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ সেই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অকার্য্য করা উচিত

নহে, যদি দৈবাৎ ঘটিয়া উঠে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

যাহা সাধনের অনুপযোগী, তাহার চিন্তা করিবে না। যদি করা যায়, তবে ভরত ঋষির ন্যায় হইতে হয়। ভরত নামক রাজর্ষি মুক্ত প্রায় হইয়াও একটা হরিণ শাবকের চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া সেই জন্মে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

বহুব্যক্তির সঙ্গ কর্ত্তব্য নয়। করিলে অনুরাগাদি অর্থাৎ কামনাদি দ্বারা কুমারী শঙ্খের ন্যায় কলহ হয়। এক কুমারী শঙ্খ হস্তে তণ্ডুল কণ্ডন (চাল কাঁড়া) আরম্ভ করিলে হস্তস্থিত বহু শঙ্খাভরণ বাজিয়া উঠিল। বাহিরে কুটুম্ব উপবিষ্ট থাকায় সে লজ্জিতা হইয়া এক গাছি শঙ্খ হস্তে রাখিল অবশিষ্ট গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তখন আর শঙ্খাভরণ বাজিয়া কলরব করিল না। তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি একাকী থাকিবেন, বহু সঙ্গী হইবেন না। সঙ্গী হইলে কলহাদি হইয়া অন্তঃকরণকে কলুষিত করত মুক্তির প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে।

বহুতর শাস্ত্র ও বহুতর উপাসনাদি থাকিলেও

ভ্রমরের ন্যায় সার গ্রাহী হইয়া শাস্ত্রোক্ত উত্তম বিদ্যাই গ্রহণ করিবে, অবিদ্যা গ্রহণ করিবে না। ভ্রমর পুষ্পের অন্য অন্য অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে ইহা সর্ব্বত্রই বিদিত আছে।

পরামর্শ ও মননাদি ব্যতীত কেবল উপদেশ দ্বারাই কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হয় না। বিরোচন মননাদি করেন নাই বলিয়া তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, মুক্তি লাভও হয় নাই।

নম্র ও ব্রহ্মচারী হইয়া গুরু সেবায় নিরত থাকিলে শীঘ্রই তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে। নচেৎ অধিক বিলম্ব হয়। যেমন ইন্দ্রের ঘটিয়াছিল।

তত্ত্ব জ্ঞানের কাল নিয়ম নাই, শীঘ্রও হইতে পারে, বিলম্বেও হইতে পারে। বাম দেবের শীঘ্র ও ইন্দ্রের বিলম্বে তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল।

এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনা করিলে মানবগণ মুক্তি লাভ করিয়া নিরন্তর কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

অন্ধ খঞ্জাদি এবং মাংসপিণ্ডাদি উৎপত্তির বিবরণ।

আমরা, স্ত্রী পুরুষ সংযোগে মানবগণের যেরূপে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা মূলে বিবৃত করিয়াছি। আপন শুভাশুভ কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য জীব নানা জগতে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবাত্মা ঐশিক নিয়ম বশে নীহার কণায় সংযুক্ত হইয়া যায়। পরে সেই নীহার কণিকা জলে স্থলে তৃণাদি শাকে ও ফলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। প্রাণীগণ বিশেষতঃ মানব জাতীয় নরনারী সেই জল, ফল ও শাকাদি ভক্ষণ করিলে, তাহা ক্রমে শোণিত শুক্রে পরিণত হয়। সেই শোণিত শুক্রের সংযোগই জীব জন্মের কারণ। কিরূপে মূক বধিরাদি বিকলাঙ্গ ও অন্ধাদির জন্ম হয়, এক্ষণে তাহার বিষয় উক্ত হইতেছে।

গর্ভস্থ জীবের জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ফলে এবং মাতাপিতার দুরদৃষ্ট ক্রমেই অন্ধ ও খঞ্জাদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। গর্ভ মধ্যে যখন শুক্র শোণিত একত্রিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন জীবের কর্ম্ম ফল হেতু প্রজাপতি

বিক লার্জ

প্রেরিত প্রকুপিত কফ ও বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া, নয়ন মধ্যে গমন পূর্ব্বক তাহার উপঘাত জন্মাইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে তথায় মালিন্য জন্মাইয়া, নয়নের দর্শন শক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাহাতেই সন্তান অন্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই রূপে দূষিত বাতপিত্ত ও কফ গর্ভস্থ সন্তানের পাদ-দেশের বিকার জন্মাইলে মূক, মস্তিষ্কের বিকার জন্মাইলে জড়বুদ্ধি, অস্থি সংস্থানের সঙ্কোচ করিয়া দিলে বামন পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যখন গর্ভ মাংসে পরিণত হয়, তখন পিতামাতার দুরদৃষ্ট ফলে প্রজাপতি কর্ত্তৃক দূষিত বায়ু দ্বারা প্রেরিত কফ রসাদি সন্তানের হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকাদি অবয়ব সংস্থান উৎপন্ন হইতে না দিলে, সেই মাংসপিণ্ড মাতার রসযোগে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কুষ্মাণ্ডা-কৃতি হয়, তাহাতেই প্রসূতি কুষ্মাণ্ডাকৃতি প্রভৃতি নানা প্রকার মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। আর যখন পুরুষের শুক্র নারীর গর্ভ গত হয়, তখন আকু-ঞ্চন ও প্রসারণ শক্তি বিশিষ্ট সেই শুক্র স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব বিশিষ্ট বীজকোষে গমন পূর্ব্বক সেই ডিম্বাকৃতি পদার্থ আনিয়া জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপিত করিলে, শুক্র শোণিতযোগে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে,

তখন অত্যুগ্র বায়ু সেই ডিম্বাকৃতি পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বহু সংখ্যক সূত্রবৎ পদার্থে পরিণত করিয়া থাকে। সেই পদার্থ সকল মাতার রসে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া, সর্পাকৃতি হয়। প্রসব কাল উপস্থিত হইলে, গর্ভিণী সেই সর্পাকৃতি পদার্থ সকল প্রসব করে। এইরূপে মাতাপিতার এবং সন্তানের কর্ম্মফলে গর্ভাবস্থায় বাত, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি শরীরস্থ ধাতু সকল দূষিত হইয়া নানা প্রকার গর্ভ বিকার উৎপাদিত করিয়া থাকে।

উপসংহার।

পাঠক মহোদয় গণ! এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করতঃ তন্মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখিবেন। এবং চিত্রগুলি অভিনিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন করিবেন, আর জীব বিশেষতঃ মানবগণ দশ মাস গর্ভ মধ্যে কি কৌশলে কি রূপ বন্দী ভাবে অবস্থান করে, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিবেন। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব সংসার সাগরের ঝটিকা, তরঙ্গে নাকানি চোবানি খাইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। মৃত্যুর পরেও পাপী মনুষ্য যমদূতের হস্তে যন্ত্রণা ভোগ করে! আবার সেই পাপী স্বকর্ম্ম ফল ভোগ করিবার কারণ জন্ম গ্রহণ করে। পাপীর জন্ম ছাগ, মেষ, শৃগাল, কুকুরাদি পশু যোনিতে, অথবা কাক শকুনী, হাস মুরগী আদি পক্ষী যোনিতে কিম্বা মেথরাদি অধম কুলে হইয়া থাকে। পাপীরাই অন্ধ, খঞ্জ, মূক, মূঢ় ও গলিত কুষ্ঠ রোগী হইয়া দেহ ধারণ করে! আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি অভ্যাসেই স্বভাব

হইয়া দাঁড়ায়, যে স্বভাব ত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কুকর্ম্ম ফলে পাপীদের এই সকল কুৎসিত জন্ম ও রোগ ভোগ হইতেছে, পাপাভ্যাস বশত স্বভাব দোষে হয়ত তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, কিম্বা অভ্যাস ও স্বভাব ত্যাগ করিতেও পারে না। ঈশ্বর প্রেরিত শাস্তি জনক ঐ সকল শাস্তি পাইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে নম্রান্তঃকরণে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিয়ত তাঁহার ধ্যান ধারণা ও সেবা আরাধনায় নিযুক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু বিপরীতই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায় মুচি মেথর প্রভৃতি ছোট লোক ও কাণা খোড়া বোবা কালা কুটে প্রভৃতি দুষ্টের শেষ, তাহাদের যদি অর্থ বল থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিত, সেই জন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ঐ সকল লোককে আর্থিক কষ্টে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছেন। [illegible] স্ত্রী পুত্র বিহীন অক্ষম বিক-[illegible] [illegible] নিশ্চি[illegible] [illegible] রাধনায় নিযুক্ত থাকিবে, না, স্ত্রী [illegible] গৃহস্থদিগের অপেক্ষা তাঁহাদে[illegible] আরো [illegible]। অর্থের লোভে তাহারা নিজ [illegible] জগতে [illegible] জন্য পৃথিবী পর্যটন করি[illegible] [illegible] কাহারও সাধুসঙ্গ

কি সদুপদেশে রতি মতি হয় না। অতএব মানবের আদি অন্ত বিবেচনা করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের সহিত সৎপথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মধুমক্ষিকার মধুসঞ্চয়ের ন্যায় ধর্ম্মার্থযুক্ত সদুপদেশ গ্রহণ করা ও তদনুসারে চলা জ্ঞানির লক্ষণ। মক্ষিকা দুই প্রকার। এক প্রকার মক্ষিকা পুষ্পের সৌরভে মাতিয়া মধুপান করে, আর এক রকম মাচি দুর্গন্ধ ভাল বাসিয়া বিষ্ঠাকুণ্ডে, পচা ও গালত মাংসে এবং ব্রণাদি ক্ষত স্থানে বসিয়া পুয রক্তাদি ভক্ষণ করিযা থাকে। তদ্রূপ মনুষ্যও দুই প্রকার। সাধু ও পাপী। সাধুস্বভাব মনুষ্য সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ ভাল বাসে, আর পাপ স্বভাব লোকেরা কুসঙ্গ ও অশ্লীল পুস্তক পাঠ করিতে নিতান্ত ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে। যাদ কেহ মনুষ্য স্বভাব পরীক্ষা করিতে চান, তবে তিনি এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

সম্পূর্ণ।